

ইসলামি সন্ত্রাসের কাউন্ট ডাউন শুরু
— পৃঃ ১৯

স্বস্তিকা

দাম : দশ টাকা

জি এস টি এক র‍্যাডিক্যাল রিফর্ম, যা মুদ্রাস্ফীতিতে লাগাম পরাবে
— পৃঃ ১৫



৬৯ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা।। ১৭ জুলাই ২০১৭।। ৩২ আষাঢ় - ১৪২৪।। যুগাব্দ ৫১১৯।। website : www.eswastika.com ।।



পণ্য পরিষেবা কর

সাধারণ মানুষের স্বস্তির পদক্ষেপ

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৯ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা, ৩২ আষাঢ়, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

১৭ জুলাই - ২০১৭, যুগাব্দ - ৫১১৯,

Website : www.eswastika.com



সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

'আমার নামে এই দাঙ্গা নয়' বলবো না কেন? মুখ্যমন্ত্রী জবাব দিন ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

খোলা চিঠি : রাজ্যে দাঙ্গা ছড়িয়ে দিতে চাইছেন মমতা ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

পাহাড়ে আগুন জ্বালিয়ে তৃণমূল নেত্রী ক্রমশ পরিস্থিতিকে বাংলা ভাগের দিকেই ঠেলে দিচ্ছেন ▯ সাধন কুমার পাল ▯ ১২

গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন— উৎস ও সম্ভাবনা ▯ কে এন মণ্ডল ▯ ১৪

জি এস টি এক র‍্যাডিক্যাল রিফর্ম যা মুদ্রাস্ফীতিতে লাগাম পরাবে ▯ কুণাল চট্টোপাধ্যায় ▯ ১৫

জি এস টি চালু সাধারণ মানুষের স্বস্তির পদক্ষেপ ▯ দেবব্রত চৌধুরী ▯ ১৬

আমাদের রাজনৈতিক নেতারা ধর্মীয় ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করতে চায় ▯ ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ▯ ১৭

ইসলামি সন্ত্রাসের কাউন্ট ডাউন শুরু ▯ প্রণয় রায় ▯ ১৯

মোদী-ট্রাম্পের যুগলবন্দি — নতুন সামরিক জোটের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন ড্রাগন ▯ সন্দীপ চক্রবর্তী ▯ ২১

ব্যাঙ্কের অনুৎপাদক সম্পদ নিয়ে অযথা উন্মাদনা অযৌক্তিক ▯ পারসা ভেঙ্কটেশ্বর রাও (জুনিয়র) ▯ ২৭

ন হিন্দু আতঙ্কি ভবেৎ ▯ অমিতাভ সেন ▯ ৩০

হিন্দুত্বের ঐতিহ্য রক্ষা করে চলেছে বালীদ্বীপ ▯ স্বপন দাস ▯ ৩১

গুড়িমল্লমের শিবলিঙ্গ ▯ সৌমেন নিয়োগী ▯ ৩২

বিদেশি মনীষীদের চোখে ভারত ▯ সলিল গেঁউলি ▯ ৩৩

যাদের না হলে চলে না ▯ কৃষ্ণেন্দু ব্যানার্জী ▯ ৩৫

নিয়মিত বিভাগ

এই সময়, সমাবেশ সমাচার : ২৪-২৬ ▯ চিঠিপত্র : ২৯ ▯ অঙ্গনা : ৩৪ ▯ সুস্বাস্থ্য: ৩৭ ▯ অন্যরকম : ৩৮ ▯ রঙ্গম : ৩৯ ▯ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

আগ্রাসী চীন

সম্প্রতি মিথ্যে অভিযোগের ভিত্তিতে সিকিম সীমান্তে বিপুল সেনা মোতায়েন করেছে চীন। কথায় কথায় দিয়ে চলেছে যুদ্ধের হুমকি। ভারতও অবশ্য চীনের চোখে চোখ রেখে সীমান্তরক্ষায় তৎপর। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয়— আগ্রাসী চীন। সমাজতন্ত্রী দেশটির আগ্রাসন, এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে দাদাগিরি এবং যুদ্ধের ভয় দেখিয়ে ভারতকে নিজের তাঁবে রাখার নানা দিক নিয়ে আলোচনা করবেন এই সময়ের সেরা লেখকরা।

হকার বন্ধুদের কাছে অনুরোধ স্বস্তিকার জন্য নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন—

বিশাল বুক সেন্টার

৪, টটি লেন
কলকাতা-৭০০০১৬

ফোন ঃ
(০৩৩) ৪০৬৪৪১০৩
৪০৬৪৪০৯৭

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

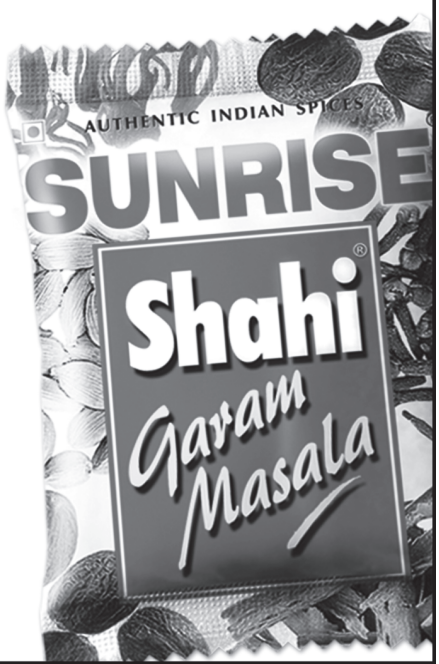

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ

পশ্চিমবঙ্গ আজ এক অপ্রিয় কারণে সারা দেশে চর্চার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। একদিকে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বাদুড়িয়া-বসিরহাট এলাকায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা অন্যদিকে দার্জিলিংয়ের পাহাড়ি এলাকায় গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে উগ্র আন্দোলন। এই দুই ঘটনাই রাজ্য তথা দেশের পক্ষে খুবই উদ্বেগের বিষয়। বাদুড়িয়ায় সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনা লইয়া রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর মতবিরোধ প্রকাশ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। খোদ মুখ্যমন্ত্রীই সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যপালকে নিশানা করিয়া নিজের উষ্মা প্রকাশ করিয়াছেন। বাদুড়িয়া বসিরহাটের সাম্প্রদায়িক হিংসা নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে তিনি রাজ্যপালের বিরোধিতায় নামিয়া পড়িয়াছেন। কেননা রাজ্যপাল এই ঘটনায় তাঁহার উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী এলাকায় ভারতীয় জনতা পার্টির কাজকর্ম বিশেষভাবে লক্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে। ভৌগোলিক কারণে পশ্চিমবঙ্গ খুবই সংবেদনশীল। কেননা বেশ কয়েকটি দেশের সহিত পশ্চিমবঙ্গের সীমানা যুক্ত। বসিরহাট বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন। রাজ্যের এই সীমান্ত সংলগ্ন এলাকাগুলিতে অশান্তি সৃষ্টি করা হইতেছে। এইসব ঘটনার হিন্দুদের ঘরবাড়ি, সম্পত্তি বাছিয়া বাছিয়া ভাঙচুর করা হইতেছে, আগুন লাগানো হইতেছে। রাজ্য পুলিশ অসহায় দর্শকের ভূমিকায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মাঝেমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে এইরকম ঘটনা ঘটিতেছে। বসিরহাটের আগে কালিয়াচক, ধুলাগড়, খড়্গপুরে একই চিত্র দেখা গিয়াছে। এইসব ঘটনায় ইহাই স্পষ্ট হইতেছে যে মমতা ব্যানার্জী ও তাঁহার দল দুষ্কৃতীদের প্রতি নরম মনোভাব পোষণ করিতেছেন। নিজেদের ভোটব্যাঙ্ক পুষ্ট করাই তাহাদের লক্ষ্য। মমতা ব্যানার্জী পশ্চিমবঙ্গকে সংবেদনশীল রাজ্য বলিতেছেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের মদত দিলে কী ভয়ঙ্কর পরিণতি হইতে পারে তাহা বুঝিতেছেন না। এই রকম এক পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের অসহযোগিতার কথা বলিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় আঘাতের গুরুতর অভিযোগ তুলিয়াছেন মুখ্যমন্ত্রী।

দার্জিলিংয়ের ঘটনা নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনী চাওয়া সত্ত্বেও তাহা পাঠানো হয় নাই। পাহাড়ে আন্দোলনের কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতার উস্কানি রহিয়াছে বলিয়াও অভিযোগ করা হইয়াছে। রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করিতেই বিজেপি ইহা করিতেছে রাজ্যের শাসক দলের এমনই অভিযোগ। কিন্তু এই অভিযোগের কোনো সারবত্তা নাই। যখনই প্রয়োজন হইয়াছে তখনই পাহাড়ে সেনাবাহিনীকে পাঠানো হইয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী একদিকে পাহাড়ে আন্দোলনকে মদত দেওয়ার জন্য কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছেন, আবার অন্যদিকে কেন্দ্রের পক্ষ হইতে সহযোগিতাও চাহিতেছেন। বসিরহাটে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্র সরকার চার কোম্পানি সেনা পাঠানোর কথা বলিয়াছিল কিন্তু মমতা তাহাতে রাজি হন নাই। বসিরহাটের পরিস্থিতি যদি এখন নিয়ন্ত্রণাধীন হয়, তাহা হইলে ওই চার কোম্পানি সুরক্ষাবাহিনী পাহাড়ে পাঠানো যাইতে পারে। একদিকে কেন্দ্রীয় সুরক্ষা বাহিনীর সাহায্য লইতে অস্বীকার করা হইতেছে। অন্যদিকে আবার তাহা পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া অভিযোগ করা হইতেছে—ইহা কতদূর যুক্তিসঙ্গত? এই রকম পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের তৎক্ষণাৎ সাহায্যের জন্য রাজ্যপালের এক ভূমিকা রহিয়াছে। তাই রাজ্যপালের সহিত তিক্ততার সম্পর্কসৃষ্টি কতটা যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে—এই প্রশ্ন উঠিতেই পারে। সহযোগিতা লাভের জন্য নিজেদেরকেও সহযোগিতার হাত বাড়াইতে হইবে। অপ্রিয় ঘটনা সৃষ্টির জন্য যাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইতেছে, তাহাদের কাছ হইতেই সহযোগিতা চাওয়া হইতেছে। বোঝাপড়ার যে অভাব, তাহা স্পষ্ট লক্ষ্য করা যাইতেছে।

সুভাষিতম্

গুণং পৃচ্ছসি মা রূপং শীলং পৃচ্ছসি মা কুলম্।

সিদ্ধিং পৃচ্ছসি মা বিদ্যাং ভোগং পৃচ্ছসি মা ধনম্।। (চাণক্য নীতি)

মানুষের গুণ জানার চেষ্টা কর, রূপ জানার প্রয়োজন নেই। স্বভাব জানার চেষ্টা কর, বংশ জানার প্রয়োজন নেই। বিদ্যার ফল জানার চেষ্টা কর, বিদ্যা জানার প্রয়োজন নেই। ধনাদির ভোগ জানার চেষ্টা কর, প্রাচুর্য জানার প্রয়োজন নেই।

বাদুড়িয়ায় হিন্দু বিরোধী হিংসায় জামাত যোগের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কালিয়াচক, ধুলাগড়ের পর এবার বাদুড়িয়া। জেহাদি, মৌলবাদী শক্তির কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ রাজ্য প্রশাসনের। ঘটনার সূত্রপাত সৌভিক সরকার নামে দ্বাদশ শ্রেণীর পড়ুয়া মাত্র সতেরো বছরের এক কিশোরের একটি ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে। 'পয়গম্বর আল্লা'কে নিয়ে একটি ফেসবুক পোস্ট, যা 'কুরুচিপূর্ণ' ও 'বিকৃত' ভাবে প্রদর্শিত হয়েছিল, সৌভিক তাকে 'শেয়ার' করে। ফেসবুকে এধরনের 'পোস্ট' আকছার চলে আসে এবং দ্রুত তা ভাইরালও হয়ে পড়ে। মূল 'পোস্ট'টির নির্মাতা যিনিই হোন না কেন, তাঁকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায় না। সৌভিকের ক্ষেত্রেও ঠিক এই ঘটনাটিই ঘটে।



সৌভিককে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

যদিও এই 'অপরাধে' ১ জুলাই মধ্যরাতে তার বাড়িতে হামলা চালায় দু'শতাধিক দুষ্কৃতী। স্থানীয় সূত্রের দাবি এই দুষ্কৃতীরা প্রত্যেকেই বহিরাগত এবং বাংলাদেশের সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢুকেছে। স্থানীয় সূত্রে এও জানাচ্ছে বাংলাদেশের জামাত উল মুজাহিদিন জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে এদের যোগ রয়েছে। এদের আক্রমণে সৌভিকের ঘর-বাড়ি চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়, জানলা, দরজা পর্যন্ত পুড়িয়ে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে বাদুড়িয়া থানার পুলিশ এসে সৌভিককে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়।

এখানেই প্রশ্ন উঠছে যে সৌভিকের শেয়ার করা 'পোস্ট' যদি কারোর ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করে থাকে এবং নাবালক হওয়া সত্ত্বেও তাকে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হতে হয়, তাহলে শ্রীজাতের একটি ফেসবুক কবিতাও একইভাবে হিন্দুদের ভাবাবেগে আঘাত দিয়েছিল, তাকে গ্রেপ্তার তো দূর অস্ত, বরং নিরাপত্তা দিয়েছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। বস্তুত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর এই তোষণ নীতিই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অশান্তির সৃষ্টি করছে। সৌভিকের গ্রেপ্তারের পরেও জেহাদি মৌলবাদীদের তুষ্ট করা যায়নি। তারা ওই নাবালকের ফাঁসির দাবি করে এবং পাকিস্তানি কায়দায় সৌভিককে মারবার জন্য বাদুড়িয়া থানা আক্রমণ করলেও প্রশাসন সরকারি তোষণ নীতির সুবাদে হাত গুটিয়ে বসেছিল।

এদিকে হিংসা ক্রমশ বাদুড়িয়া ছাড়িয়ে গোটা বসিরহাট মহকুমাতেই ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ৩ তারিখ সকাল থেকে কেওসা বাজার, হুগলি বাঁশতলা, রামচন্দ্রপুর, তেতুলিয়া, গোকুলপুর, মগরা, শায়েস্তানগর প্রভৃতি জায়গায় বাংলাদেশি জেহাদিদের প্ররোচনায় স্থানীয়রা পথ-অবরোধ ও সেইসঙ্গে হিন্দুদের ওপর সংগঠিত হামলা, হিন্দুদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া ও দোকান-পাট লুঠ করতে শুরু করে। পুলিশের ভূমিকা এক্ষেত্রেও নীরব দর্শকের।

হিন্দুদের ওপর এই তাণ্ডব সত্ত্বেও 'শান্তি' রক্ষার খাতিরে পশ্চিমবঙ্গের সংবাদমাধ্যমগুলির বড়ো অংশ এই খবরকে 'ব্ল্যাক আউট'-এর সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু সব ফাঁস করে দেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। বিভিন্ন সূত্রের বাদুড়িয়া কাণ্ডের খবরে উদ্বিগ্ন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী ৪ জুলাই বিকেলে মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করে জানতে চান যে ঘটনার পর তিনদিন কেটে গেলেও রাজ্য সরকার কী ব্যবস্থা নিয়েছে। কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি মুখ্যমন্ত্রী। আর এই ব্যর্থতা ঢাকতে, বাংলার মানুষের 'সেন্টিমেন্ট'কে উস্কে দিতে তিনি সাংবাদিক বৈঠক করে রাজ্যপালের কাছে 'অপমানিত' হওয়ার নাটক করেন। ফলে পুরো বিষয়টি একদিকে যেমন ফাঁস হয়ে যায়, তেমনি অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী একেবারে প্রকাশ্যে স্বীকার করে নেন যে, 'এই কমিউনিটিটা (পড়ুন মুসলমান সম্প্রদায়), যারা কাল থেকে (দাঙ্গা) শুরু করেছে, তাদের জন্য আমায় অনেক কথা শুনতে হয়েছে (রাজ্যপালের) কাছে।' এমনকী প্রবল খেদে মমতা এমন হুঁশিয়ারিও মুসলমানদের দেন যে 'মা-মাটি-মানুষের সরকার আপনাদের অনেক প্রোটেকশান দিয়েছে, প্রোটেকশান দিচ্ছেও কিন্তু আমার বুকেই যদি শেল বেঁধানোর চেষ্টা করেন তবে আপনাদের পক্ষে থাকবো না।'

মুখ্যমন্ত্রীর এই বয়ানের ফলে যে বাজারি সংবাদমাধ্যমগুলি এতকাল বাদুড়িয়ায় জেহাদি হামলাকে 'শান্তি' রক্ষার খাতিরে পরিবেশিত হতে দেয়নি, মুখ্যমন্ত্রীর অপমানের প্রতিশোধ নিতে গিয়েই কাল হলো, ঝুলি থেকে বেড়াল একেবারে বেরিয়ে পড়লো। আর ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী, হিন্দু-সাম্প্রাদায়িকতার বিষে যাঁদের চক্ষে হা-হাসান, হা-হুসেন ধারায় দরদর জল পড়ে, তাঁরা কেউ এখন খেয়াল গাইতে ব্যস্ত, কারোর বা কানের পর্দা ফেটেছে, মানে কেউ কিছু শুনতে, বুঝতে পারছে না। এরকম স্থানিক মূক -বধিরতার কার্যকারিতা একমাত্র পশ্চিমবঙ্গের 'বুদ্ধিজীবী' ছাড়া আর কোথাও দেখা যাবে না বলেই রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন।

রাজ্যে যখন অশান্তির আগুন জ্বলছে, তখন আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে প্রদীপের সলতে জ্বালিয়ে বসে থাকা নেতারা নবান্নে সূর্যোদয়ের স্বপ্নে বিভোর। ফেসবুক জুড়ে প্রচার চলছে বাম আমলে নাকি রাজ্যে দাঙ্গা হয়নি। কু-লোকে মনে করিয়ে দিচ্ছে তসলিমাকে রাজ্যে ঢুকতে না দেওয়া এবং একদা সিপিএমের, বর্তমানে তৃণমূলের কাছে আশ্রয় নেওয়া এক কবি বাংলাদেশ সরকারের নিকট আবেদন রেখেছিল দয়া করে একশোটা ভিখিরি পাঠান, আমরা আশ্রয় দেব কিন্তু তসলিমাকে পাঠাবেন না। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় কমিউনিজমের সঙ্গে জন্মলগ্ন থেকে জেহাদি যোগ, পাকিস্তানের সমর্থক, চীনের দালালির প্রশ্নে নয়া পার্টি তৈরি থেকে সাম্প্রতিকতম জে এন ইউ কাণ্ড কিংবা কাশ্মীরে সেনাবাহিনীকে টার্গেট করা, আগাগোড়া দেশ-বিরোধী এই শক্তি ফেসবুকে সক্রিয় ছিল গোলমাল পাকাতে। এবং এদেরই মতাদর্শে বিশ্বাসী একটি সংবাদপত্র ও বৈদ্যুতিন মাধ্যম 'সম্প্রীতি' প্রচারের মাধ্যমে প্রকৃত সত্যকে বিকৃত করেছে, হিন্দু-বিরোধিতায় মদত দিয়েছে। ঠিক যে কাজটি করতে গিয়ে বসিরহাটের তৃণমূল বিধায়ককে জনতার তাড়ায় র‍্যাফের গাড়িতে চোরের মতো পালাতে হয়েছে।

তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করে বাংলাদেশের জামাতিদের সঙ্গে এরাজ্যের শাসকদলে একাংশের যোগাযোগ খুব ভালো। ফলে হিন্দু বিরোধী দাঙ্গার প্ররোচনা চলতেই থাকবে এবং কালিয়াচক, ধুলাগড়, বাদুড়িয়ার পুনরাবৃত্তি চলতেই থাকবে। যে পোস্টকে ঘিরে এত কাণ্ড তার পেছনেও জেহাদিদের হাত থাকতে পারে বলে সাইবার বিশেষজ্ঞদের অনুমান। যেমন ফেসবুকে মনীষীদের অপমানকারী কিছু পোস্ট কমিউনিস্টদের তৈরি করা এবং সঙ্ঘ-বিরোধী মানসিকতা তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। বাদুড়িয়া-কাণ্ডেও এরই প্রতিফলন দেখা যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তাছাড়া সীমান্তে গো-পাচার ও অস্ত্র-পাচার রোধে বিএসএফের সক্রিয়তাও জেহাদিদের মরিয়া করে তুলতে পারে। অ্যাম্বুলেন্স ভর্তি অস্ত্রের কথা বাদুড়িয়া কাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে শোনা গিয়েছে। এই আক্রমণকে পূর্ব-পরিকল্পিত এবং পরিকল্পনা মাফিক ফেসবুক পোস্টকে ছুঁতো করে সংঘটিত করা হয়েছে তা রাজ্যের শাসকদল চেপে গেলেও জনপ্রিয় সংবাদমাধ্যম সানডে গার্ডিয়ান প্রকাশ করেছে। স্থানীয় দুষ্কৃতীদের সাহায্যে বাংলাদেশি জঙ্গিরা এই ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে তা পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশের সাতক্ষীরার সাংসদ মোস্তাফা লুতফুল্লাসাহেব।

পশ্চিমবঙ্গে জেহাদি হামলার বিরুদ্ধে বেঙ্গালুরুতে বিক্ষোভ সমাবেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বাংলায় হিন্দুদের অত্যাচারের প্রতিবাদে এবার গর্জে উঠলো বেঙ্গালুরুর বাঙালি প্রযুক্তিবিদেরা। বাংলায় ক্রমাগত হিন্দুদের ওপর জেহাদি হামলার বিরুদ্ধে একজোট হয়ে রুখে দাঁড়ালো বেঙ্গালুরুর প্রবাসী বাঙালি প্রযুক্তিবিদেরা। সমস্বরে একটাই স্লোগান ছিল 'সেভ বেঙ্গল'। গত ৮ জুলাই সন্ধ্যেয় গান্ধী মূর্তির পাদদেশে সিটিজেন ফর ডেমোক্রেসি (সিএফডি)-র নামে একটি মঞ্চের উদ্যোগে কয়েকশো বাঙালি এই নীরব প্রতিবাদে শামিল হন। বাঙালি চিত্র শিল্পীরা বাংলায় হিন্দু অত্যাচারের এই করুণ ছবি নিজেদের সৃজনশীলতায় ফুটিয়ে তোলেন। সমবেত বাঙালিরা গর্জে ওঠেন মমতা সরকারের নির্লজ্জ মুসলমান তোষণের বিরুদ্ধে। হিন্দুদের বিষয় সম্পত্তি ও জীবন রক্ষায় বর্তমান সরকারের অনীহা নিয়েও ক্ষোভে ফেটে পড়ে সমবেত জনতা। ধ্বনিত হয়— 'খুন, রক্ত, ক্ষমতা, দিদির নাম মমতা', জিহাদি হটাও, বাংলা বাঁচাও', 'জেহাদিদের কালো হাত, ভেঙে দাও গুড়িয়ে দাও' ইত্যাদি স্লোগান।

সমস্ত জাতীয় স্তরের মিডিয়া হাউস এই প্রতিবাদ সভা কভার করে এবং দেশবাসীর কাছে পৌঁছে দেয়। সিটিজেন ফর ডেমোক্রেসি (সিএফডি) পক্ষ থেকে ভাস্বর গোস্বামী, জয়দীপ ব্যানার্জী, বিশ্বরূপ রায়, রাজেশ পরমার, রাধাকৃষ্ণ হল্লা বক্তৃতায় নিজেদের ক্ষোভ ও উদ্বেগের কথা তুলে ধরেন। উপস্থিত কন্নড় ভাষী বিদ্বজ্জনেদের মধ্যেও বাংলার হিন্দুদের জন্য উদ্বেগ ছিল চোখে পড়ার মতো। সভা শেষ হয় মোমবাতির আলোয় নিহত কার্তিক ঘোষের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে। টুইটার ও ফেসবুকের মতো জনপ্রিয় সোশাল মিডিয়াতেও এই সেভ বেঙ্গলের মাধ্যমে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। একই ভাবে কলকাতা, হায়দরাবাদ, দিল্লি, মুম্বইতেও সেভ বেঙ্গলের প্রতিবাদ সভা আয়োজিত হয়। গত ৮ জুলাই সন্ধ্যায় কলকাতায় বিশিষ্ট সাংবাদিক রন্তিদেব সেনগুপ্তের নেতৃত্বে সেভ বেঙ্গলের পক্ষ থেকে মোমবাতি মিছিল হয়।

পিঠ বাঁচাতে মমতার সঙ্ঘ-বিজেপির ওপর দোষারোপ

বসিরহাট-কাণ্ডে লস্করের ছায়া, জামাতের হাত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ যে ফেসবুক পোস্ট নিয়ে বসিরহাট-বাদুড়িয়া সাম্প্রদায়িক হিংসায় উন্মত্ত হয়ে উঠল তার পিছনে ছিল লস্কর-ই-তৈবার হাত। শৌভিক সরকারের ফেসবুক আই ডি ব্যবহার করে যে ছবি পোস্ট করা হয়েছিল সেটা তৈরি করেছিল লাসারের সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ারদের একটি দক্ষ সাইবার উইং। এমনই চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশ করেছে জনপ্রিয় সংবাদ মাধ্যম দা সানডে গার্ডিয়ান। রাজ্য পুলিশেরও বক্তব্য, এখনও পর্যন্ত যা সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া গেছে তাতে পরিষ্কার, ওই ফেসবুক পোস্ট ভারতের বাইরে তৈরি হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতই পিঠ বাঁচাতে যাবতীয় দায়



মোস্তাফা লুতফুল্লাহ

সঙ্ঘ-বিজেপির ওপর চাপানোর চেষ্টা করুন, বসিরহাট-বাদুড়িয়া কাণ্ডের সঙ্গে লস্কর-ই-তৈবা, বাংলাদেশ থেকে তাড়া খাওয়া দুষ্কৃতী এবং তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের যোগ রয়েছে। পুলিশের একাংশের দাবি, গত বৃহস্পতিবার যা হয়েছে তা তৃণমূলেরই অন্তর্কলহ। স্থানীয় তৃণমূলের একটি গ্রুপ তিনটে পার্টি অফিস জ্বালিয়ে নিজেদের শক্তি জাহির করে। পরে বিধায়ক দীপেন্দু বিশ্বাস তাদের ধড়পাকড়ের চেষ্টা করলে অশান্তি আরও বাড়ে।

পুলিশ সূত্রের খবর অনুযায়ী, ফেসবুক পোস্টটির উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের আবেগে আঘাত করে দাঙ্গা বাধানো। পুরো অপারেশনটির দায়িত্ব ছিল লস্করের রাজনৈতিক শাখা জামায়াত-দাওয়ার ওপর। ভিড়ের মধ্যে মিশে থেকে তারা অপেক্ষা করছিল হিন্দুদের আক্রমণ করার জন্য। পুলিশের বক্তব্যের সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে দা সানডে গার্ডিয়ানের দেওয়া বর্ণনা। দুষ্কৃতীরা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে বসিরহাট-বাদুড়িয়াকে বেছে নিয়েছিল খুনখারাপি করে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাবার সুবিধার জন্য।

ওদিকে অন্য একটি খবরে প্রশাসনের অন্দরমহলে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বসিরহাট-বাদুড়িয়া কাণ্ডের অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী যে বাংলাদেশের জামাত গোষ্ঠী তার সুস্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে সাতক্ষীরার সাংসদ মোস্তাফা লুতফুল্লাহ্ বলেন, '২০১২ সাল থেকে ওরা বাংলাদেশ নিরাপত্তা বাহিনীর তাড়া খেয়ে বসিরহাট অঞ্চলে ঢুকছে। ওদের কাজই দাঙ্গা বাধানো। কিন্তু বহুবার বললেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমার কথায় কর্ণপাত করেনি।' তাঁর অভিযোগ, বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে আসা দুষ্কৃতীদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার নির্বাচনের সময় ভোটলুটের কাজে ব্যবহার করে। অঙ্কটা পরিষ্কার, মুসলমানদের তোয়াজ করে চললে ৩০ শতাংশ মুসলমান ভোট বাঁধা। আবার আতঙ্ক সৃষ্টি করে মুসলমান দুষ্কৃতীরা শাসক-বিরোধী হিন্দু ভোটারদের ভোট দিতে দেয় না। দুটোই শাসকদলের পক্ষে লাভজনক। এই ট্র্যাডিশন যেমন বাম আমলে ছিল, পরিবর্তনের জমানাতেও একইরকম রয়েছে।

বিহারে কি জোট সরকার ভাঙছে?

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বিহারে কি জোট সরকার ভাঙতে চলেছে? লালুপ্রসাদ যাদব ও তাঁর পরিবারের বাড়িতে সিবিআই তল্লাসির পর বিহারের রাজনৈতিক মহলে এই প্রশ্নটাই বারে বারে উঠে আসছে। বিশেষত, বিহারের বিজেপি রাজ্য কমিটি যখন জানায় তারা রাজ্যের স্বার্থে নীতীশকুমার সরকারকে সমর্থন করতে রাজি যদি জেডি (ইউ) লালুর আরজেডি ও কংগ্রেসের সঙ্গ ছাড়ে। উল্লেখ্য, তল্লাসির পর নীতীশ আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদকে ফোন করেছিলেন। ফোনে কী কথা হয়েছে তা জানা না গেলেও আর জে ডি-র পরবর্তী কার্যকলাপে এই সন্দেহ দানা বাঁধছে। আর জে ডি বিধায়ক তথা নীতীশ সরকারের মন্ত্রী আব্দুল বারিক সিদ্দিকি বলেছেন, আর জে ডি নেতা ও উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তেজস্বী প্রসাদ যাদবের কাজকর্ম নিয়ে সম্প্রতি আর জে ডি বিধায়ক দলের বৈঠকে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। তাই তাঁর পদত্যাগ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে কেন? এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশের নীরবতা নিয়ে তাঁর ব্যাখ্যা, তিনি কাজ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন।

বিহার বিজেপির সভাপতি নিত্যানন্দ রাই তাঁদের দলীয় অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, তারা দল ভাঙাভাঙির খেলায় যাবেন না। সরকারেও যোগ দেবেন না। তবে বাইরে থেকে সমর্থন জানাবেন। তাঁর বক্তব্য, ২৪৩ জনের বিধানসভায় জে ডি (ইউ)-র ৭১ জন বিধায়ক আছেন। এনডিএ-র আছে ৫৮ জন। এর মধ্যে ৫৩ জনই বিজেপি-র। জেডি (ইউ) ও এনডিএ মিলে বিধায়কের মোট সংখ্যা ১২৯ জন যা ম্যাজিক ফিগার' থেকে আরও ৭ বেশি। আর জে ডি এবং কংগ্রেসের সঙ্গ ছাড়লে নীতীশের সরকার টিকিয়ে রাখতে যা প্রয়োজন এতে তা মিটে যাবে।

গোসাবায় শ্রীগুরু পূর্ণিমা উৎসবে জেহাদি হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ৯ জুলাই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গোসাবা ব্লকে পাঠানখালী অঞ্চলের বটতলী গ্রামে শান্তিরাম মুণ্ডার বাড়িতে ১৫ জন বালক কিশোরকে নিয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শ্রীগুরু পূর্ণিমা উৎসব পালন করা হচ্ছিল। হঠাৎ করে প্রায় দেড়শো মুসলমান ওই বাড়িতে আক্রমণ করে জেলা কার্যবাহ সঞ্জয় সিংহ, জেলা প্রচারক পরিমল দোলুই ও প্রসেনজিৎ সরকারকে মারতে মারতে তুলে নিয়ে যায়। শান্তিরাম মুণ্ডার বাড়ি লুটপাট করা হয়। টিভি, আসবাব সব ভেঙে ফেলে বহু জিনিস লুট করে নিয়ে যায়। অনেকক্ষণ পর্যন্ত ৩ জনকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

পরে গ্রামবাসীদের চাপে প্রায় ৩ ঘণ্টা পর তাদের উদ্ধার করে গোসাবা থানায় আনা হয়। বিনা কারণে পুলিশ আর্মস অ্যাক্ট দিয়ে ৩ জনকে আটকে রাখে। তাদের নিঃশর্ত মুক্তি ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে প্রায় শতাধিক গ্রামবাসী গোসাবা থানায় ধরনায় বসেন। পুলিশ গ্রামবাসীদের আবেদনে কর্ণপাত না করে ১০ তারিখে আলিপুর কোর্টে চালান করে। সূত্রের খবর, পুলিশ প্রশাসনের এই নির্লজ্জ ভূমিকায় গ্রামবাসীদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

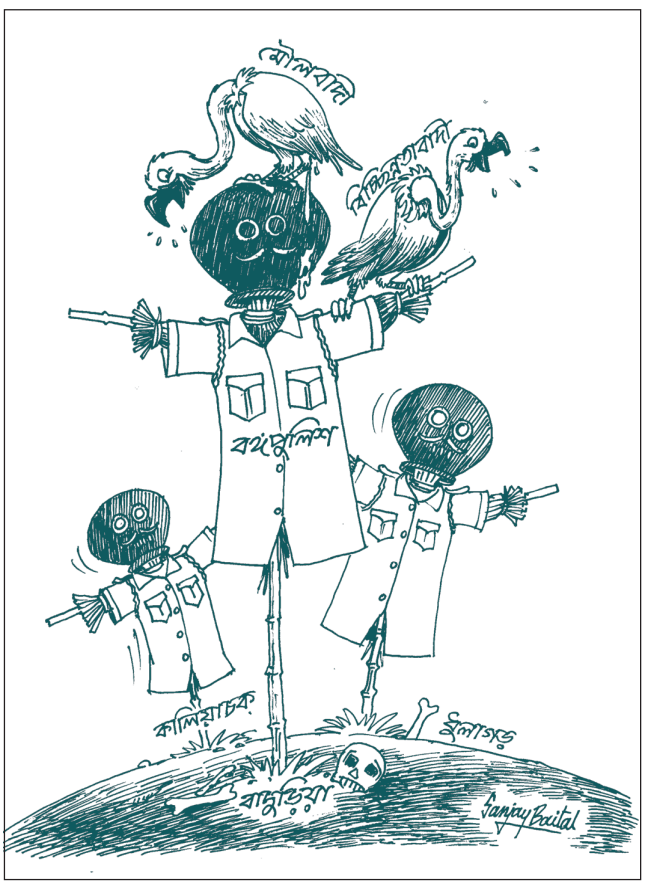

উবাচ



আর. আর. ভাটনগর
কেন্দ্রীয় পুলিশবাহিনীর ডিজি

“নিয়ম অনুযায়ী এই যাত্রীরা নিজেদের নাম নথিভুক্ত করেননি। এমনকী নিরাপত্তারক্ষী বেষ্টিত কোনো যাত্রা কনভয়েও তারা ছিলেন না। তার ওপর রাতের কারফিউ ভেঙেছেন। ...এ বছর আমরা কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু তীর্থযাত্রীরা নিয়ম না মানলে এই বিপুল আয়োজন করে কী লাভ!”

জঙ্গিদের হাতে সাতজন অমরনাথ যাত্রীর হত্যা প্রসঙ্গে।



সুষমা স্বরাজ
কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী

“পাকিস্তানের যেসব নাগরিক চিকিৎসার জন্য ভারতে আসতে চান তাদের প্রতি আমার সহানুভূতি রয়েছে। অথচ আমি যখন কুলভূষণ যাদবের মায়ের ভিসা মঞ্জুর করার অনুরোধ জানিয়ে মি. সরতাজ আজিজকে চিঠি লিখলাম উনি কোনও উচ্চবাচ্য করলেন না। এমনকী চিঠির প্রাপ্তিস্বীকারও করলেন না।”

কুলভূষণের সঙ্গে তাঁর মায়ের সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে।



গোপাল বাগলে
বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র

“পাকিস্তান যে শুধু লস্কর-ই-তৈবার ভাষায় কথা বলে তাই নয়, বুরহান ওয়ানিকে স্বাধীনতা সংগ্রামীর তকমাও দেয়।”

বুরহান ওয়ানির মৃত্যুর বর্ষপূর্তিতে পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে।



মোস্তাফা লুতফুল্লাহ্
সাতক্ষীরার সাংসদ

“২০১২ সাল থেকে দুষ্কৃতীরা বাংলাদেশের নিরাপত্তাবাহিনীর তাড়া খেয়ে বসিরহাট সংলগ্ন এলাকায় ঢুকছে। আমি বহুবার বলেছি, এদের কাজ দাঙ্গা ধাঁধানো। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ণপাত করেনি।”

বসিরহাটে হিন্দুদের ওপর মুসলমান দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব প্রসঙ্গে

‘আমার নামে এই দাঙ্গা নয়’ বলবো না কেন? মুখ্যমন্ত্রী জবাব দিন

সবিনয়ে স্বীকার করছি ইদানীং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাবার্তা এবং আচরণে এখন আর অবাক হই না। তার কারণ, ক্ষমতা এবং দম্ভ তাঁর মাথাটা সর্বদা গরম করে রাখে। এতটাই গরম করে রাখে যে কোথায় কখন তিনি কি বলছেন নিজেই জানেন না। সম্প্রতি তিনি নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে অভিযোগ করেছেন যে বিজেপি বসিরহাট-বাদুড়িয়ায় সাম্প্রদায়িক হিংসায় প্ররোচনা দিয়েছে। উত্তরের পাহাড় থেকে দক্ষিণের বসিরহাটে সাম্প্রদায়িক অশান্তি ছড়ানো বিজেপির পরিকল্পিত ইন্ধন। এ পর্যন্ত ঠিক আছে। রাজ্যে বিজেপি এখন প্রধান বিরোধী দল। পুলিশ ও প্রশাসন পরিচালনায় মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর দল তৃণমূল চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ। এই ব্যর্থতার দায় স্বাভাবিকভাবেই শাসকদল বিরোধীদের ঘাড়ে চাপাবে। একদা সিপিএম ক্ষমতায় থাকাকালে ব্যর্থতার দায় কংগ্রেসের ঘাড়ে চাপাতো। তখন অবশ্য তৃণমূলের জন্ম হয়নি। মমতা এখন সেই পথেই হাঁটছেন। সমস্যা হচ্ছে দিদি যখন একই সঙ্গে বলছেন যে কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতাদের নির্দেশে বিএসএফ বসিরহাট সীমান্তে পাহারা তুলে নিয়ে বাংলাদেশি মুসলমানদের ঢুকিয়ে এলাকায় দাঙ্গা করিয়েছে। প্রশ্নটা এখানেই। এতকাল জেনে এসেছি যে বিজেপি হিন্দুত্বের পক্ষে কথা বলে। হিন্দু পার্টি। এখন দিদি বলছেন, বাংলাদেশ থেকে লোক ঢুকিয়ে বিজেপি হিন্দুদের বাড়িতে আগুন দিয়েছে। দোকান লুঠ করেছে। সাম্প্রদায়িক অশান্তি সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ বিজেপি হিন্দু বিরোধী পার্টি। কোনটা সত্যি? বিজেপি হিন্দুত্বের পক্ষে অথবা বিপক্ষে।

মমতার প্রচণ্ড চাপের কাছে নতি স্বীকার করে কলকাতার সংবাদমাধ্যম বসিরহাট-বাদুড়িয়ার ঘটনা চাপা দিয়ে রাম-রহিমের সখ্যের নানা কাল্পনিক কাহিনি ছেপেছে। কিন্তু দিল্লির দুটি বড় টিভি চ্যানেলে দাঙ্গার বিষয়ে কিছু খবর দেখিয়েছে। এতেই দিদির মাথা গরম হয়েছে। সত্য ঘটনা তা যতই অপ্রিয় হোক না কেন তা প্রকাশ করাটা

গূঢ় পুরুষের কলম

সাংবাদিকদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। কতটা প্রকাশ করলে তা প্ররোচনা দেওয়া হয় তা পেশাদার সাংবাদিকদের ভালভাবেই জানা আছে। এই ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের যে রুলিং আছে তা’ সাংবাদিকতার ক্লাসে পড়ানো হয়। দিদির কাছে আলাদাভাবে শিক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন নেই। রেপ বা শ্লীলতাহানির ঘটনায় ভিকটিমের নাম বা পরিচয় যে প্রকাশ করা যায় না সেকথা সাংবাদিকদের অজানা নয়। দিদির সাংবাদিকদের আচার সংহিতা না পড়ালেও চলবে। দিদির মনে রাখা উচিত ছিল যে বসিরহাট বিধানসভা কেন্দ্রটি এখন তৃণমূলের দখলে। তাই দাঙ্গা যদি পরিকল্পিতভাবে করা হয়ে থাকে তবে সেই তথাকথিত পরিকল্পনার কথা তৃণমূল নেতৃত্বের জানার কথা। বাইরের লোক ঢুকিয়ে প্রায় ছয়দিন ধরে দাঙ্গা হাঙ্গামা চললো অথচ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব টেরটি পেলেন না তা হয় কী করে? প্রকৃত সত্য হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গের আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকায় রাজ্য প্রশাসন বেশ নড়বড়ে। পুলিশ এবং বাংলাদেশি পাচারকারীদের সখ্য বসিরহাটের বাসিন্দারা দেশভাগের পর থেকেই জানেন। তাঁরা জানেন ইছামতী নদী পেরিয়ে কীভাবে বাংলাদেশি দুর্বৃত্তরা নিত্য আসা যাওয়া করে। সীমান্তের গ্রামে গ্রামে হিন্দু পরিবাররা এখন দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকেন এই বুঝি খুন হয়ে যেতে হবে। বাংলাদেশের সঙ্গে লাগোয়া সীমান্তের গ্রামে হিন্দুরা সংখ্যালঘু। ভোট রাজনীতিতে তাঁদের গুরুত্ব নেই বললেই চলে।

পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী সুশীল সমাজ নীরব কেন? কয়েক দিন আগেই যাঁরা গোখাদকদের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে মোমবাতি হাতে মিছিল করে স্লোগান দিয়েছেন, ‘নট ইন মাই নেম’। তাঁরা কোথায় গেলেন? গোরক্ষার নামে কাউকে পিটিয়ে মারা অথবা আইন নিজেদের হাতে নেওয়াকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিন্দা করছি। মমতার কথা যদি সত্যি বলে ধরে নিই তবে বাংলাদেশ থেকে লোক ঢুকে বসিরহাট-বাদুড়িয়ায় হিন্দুদের উপর অবাধ আক্রমণের, দাঙ্গার প্রতিবাদে কলকাতায় মোমবাতি হাতে মিছিল হবে না কেন? বাংলার সুশীল সমাজ জবাব দিন। ভিন্ন রাজ্যে ঘটে যাওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদে যদি মিছিল হয় তবে নিজের রাজ্যে দাঙ্গার প্রতিবাদে সুশীল সমাজ কেন বলবেন না ‘আমার নামে এই দাঙ্গা নয়’। কাশ্মীরের হিন্দু পণ্ডিত, কেরলে নিহত আর এস এস কর্মী, উত্তরপ্রদেশের নিহিত হিন্দুরা, গোধরা কাণ্ডে নিহত ৫৬ জন করসেবক যাঁদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়, বসিরহাট, কালিয়াচক, ধূলাগড়ের নিহত ক্ষতিগ্রস্থ হিন্দু বাসিন্দারা, নিহত সেইসব ভারতীয় সৈনিক যাঁদের মুণ্ডগুলি জেহাদিরা কেটে পাকিস্তানে নিয়ে গিয়েছিল তাঁদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বাঙালি সুশীল সমাজ কি একটিও মোমবাতি জ্বালাবে না? সত্যি জানতে ইচ্ছা করে যে সারা বিশ্বে আই এসের জেহাদে যখন হাজার হাজার নিরীহ মানুষ প্রতিদিন খুন হয়ে যাচ্ছেন তখন জেহাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল বা লেখালেখি হয় না কেন? ■

রাজ্যে দাঙ্গা ছড়িয়ে দিতে চাইছেন মমতা ?

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী,

না, আজ আর দিদি সম্বোধন নয়। কী চাইছেন আপনি! আগুন জ্বলছে পাহাড় থেকে বাদুড়িয়ায়। কালিয়াচক থেকে দেগঙ্গায়। আপনার পুলিশ সব দেখার পরেও চুপ। এক পক্ষ বিনা বাধায় আগুন জ্বালানোর পরে আপনি জেগে উঠে মাননীয় রাজ্যপালকেই দোষ দিলেন। কিন্তু আপনি কি প্রশ্রয় দেননি। আজ বরকতি নিয়ে আপনি চুপ, কিন্তু যখন টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম খোদ প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়েছে তখন আপনি চুপ থেকেছেন। আমার তো মনে হয় রাজ্যপালের আরও আগে আপনাকে সতর্ক করা উচিত ছিল। হয়তো করেছিলেন। কিন্তু আপনি তাতে গুরুত্ব দেননি। এখন আগুন দাউ দাউ চেহারা নেওয়ার পরে ইস্যু ঘোরাতে রাজ্যপালের দিকে আঙুল তুলেছেন।

এখনও আপনি শিক্ষা নেননি। রাজ্য জুড়ে অশান্তি বাড়াতে আপনি রাজ্যের প্রতি বুথে শান্তিবাহিনী গঠনের কথা ঘোষণা করেছেন। এটা কি বিজেপির বিস্তারক অভিযান রুখতে দাঙ্গার নির্দেশ নয়! আপনার এই হঠকারী ও সর্বনাশা সিদ্ধান্তের কী পরিণাম হবে তা ভেবেই অস্বস্তি হচ্ছে। তৃণমূলের বুথভিত্তিক গৃহযুদ্ধও বাড়বে। শাসক দলের কোন্দল শান্তি দেবে না কাউকে।

দিদি কয়েকটি প্রশ্ন রইল আপনার কমিটি গঠন নিয়ে। আমাকে নয়, পারলে সাংবাদিক সম্মেলন করে জনগণ মানে আপনার মা-মাটি-মানুষকে জবাব দেবেন।

১. কে বা কারা এই বাহিনী বা শান্তি কমিটিতে থাকবেন? কোন ব্যক্তির আধিপত্য থাকবে? দখলদারির লড়াই বাধবে না তো?

২. এই কমিটি সরকারি না বেসরকারি? সরকারি হলে শর্ত, নিয়ম, এক্তিয়ার কী কী? আইনে সংস্থান কোথায়?

৩. শান্তিবাহিনীর পিছনে পুলিশের সহযোগিতা থাকবে বলেছেন। তাতে দাদাগিরি এবং ফতোয়াবাজির নতুন মঞ্চ হয়ে উঠবে না তো?

৪. পাড়ায় পাড়ায় শান্তিবাহিনী বনাম শান্তিবাহিনীর যুদ্ধ লাগলে কী হবে?

৫. গোষ্ঠীবাজির দৌলতে শান্তিকমিটির পাল্টা শান্তিকমিটি গড়ে উঠবে না তো?

৬. কমিটির মাথা কে হবে? কমিটির অধিকার কী কী? কাজের এলাকা কী? নারীনির্যাতন, ভাড়াটিয়া মালিক সমস্যা, জল জমা, চাঁদার জুলুম, সিন্ডিকেট সমস্যা, যে-কোনো বিষয়ে মানুষের ক্ষোভ সামলানো, নাকি শুধু মারামারি হলে থামানো?

৭. পুলিশ প্রশাসন দিয়ে সামলানো যাচ্ছে না বলেই কি শান্তি কমিটি? নাকি বিজেপি আটকাতে এটা নতুন বাহিনী? তবে কি আপনি পুলিশমন্ত্রী হিসেবেও ব্যর্থ?

৮. রাজ্যের যেসব এলাকায় জেহাদিরা প্রবল শক্তিধর, বোমা গুলির মজুত ও ব্যবহার যথেচ্ছ সেখানে শান্তিকমিটি কী করবে?

৯. পুলিশ জানে কোন এলাকায় কারা বিপজ্জনক। কারা কারা গোলমাল পাকায়। কোথায় অস্ত্র আছে এবং কারা রাখে। কোথা থেকে আসে অস্ত্র। পুলিশ তাদের ধরতে পারে না। উপরে বড় হাত। সেখানে শান্তিকমিটি বা শান্তিবাহিনী কী করবে?

না, আর প্রশ্ন নয়। এর চেয়ে কাজটা সহজ করে নিন। ভালো পরামর্শ দিচ্ছি। যে-কোনো ভাবে বিজেপি দলটাকে নিষিদ্ধ করে দিন এই রাজ্যে। সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না। সব থেকে বড় কথা বিজেপি নামক জুজুর ভয়টাই থাকবে না। তখন শান্তি আর শান্তি।

—সুন্দর মৌলিক

পাহাড়ে আগুন জ্বালিয়ে তৃণমূলনেত্রী ক্রমশ পরিস্থিতিকে বাংলা ভাগের দিকেই ঠেলে দিচ্ছেন

সাধন কুমার পাল

গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা সূত্রের খবর, মমতা ব্যানার্জী নাকি দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন মাধ্যমে বিমল গুরুংয়ের কাছে বার্তা পাঠাচ্ছিলেন, 'বিজেপি সঙ্গ ছেড়ে তৃণমূলের সঙ্গে আসুন তাহলে সব ঠিক, না হলে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বেন'। এর কিছুদিন আগে কোচবিহারে বিজেপির নির্বাচনী জোটের আরেক সঙ্গী জিসিপিএ-এর নেতা অনন্ত রায় (মহারাজ বলে খ্যাত)-কেও নাকি নানা ভাবে একই প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। নেত্রীর প্রস্তাবে সায় না দেওয়ায় অনন্ত রায়ের কপালেও জুটেছে মিথ্যা অপবাদ, মিথ্যা মামলা, পুলিশি হেনস্থা। তবে মোর্চা সূত্র যাই বলুক না কেন দার্জিলিং নিয়ে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপেই স্পষ্ট যে তৃণমূল নেত্রী বিমল গুরুংকে ঘিরে ফেলার জন্য অনেকদিন আগে থেকেই ছক কষে এগোচ্ছিলেন।

প্রথম ধাপে নেত্রী একান্ত অনুগত অফিসারদের বিভিন্ন পদে বসিয়ে দার্জিলিং জেলা প্রশাসনকে মুঠোয় নিয়ে রেখেছেন। অখুশি নেতা- কর্মীদের নানা ভাবে প্রলোভিত করে মোর্চায় ভাঙন ধরিয়ে নিজের দল তৃণমূল কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার জন্য নিরন্তর প্রয়াস চালিয়েছেন। নেত্রী উঠে পড়ে লেগেছিলেন বিমল গুরুংয়ের উপর অসন্তুষ্ট বেশ কিছু প্রথম সারির গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা নেতাকে তৃণমূলমুখী করতে। ২০১৫ সালে কালিম্পংয়ের প্রথম সারির মোর্চা নেতা হরকাবাহাদুর ছেত্রীর দলত্যাগ করে নিজস্ব দল গঠনের ঘটনা ছিল নেত্রীর দল ভাঙানোর খেলায় বড় সাফল্য। ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনে কালিম্পং বিধানসভা কেন্দ্রে হেরে যান হরকাবাহাদুর। পাহাড়ে বাকি দুটি কেন্দ্র দার্জিলিং ও কার্শিয়াং কেন্দ্রেও পরাজিত হন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা। ধাক্কা খায় নেত্রীর পাহাড় দখলের পরিকল্পনা। নেত্রীর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে হরকাবাহাদুরও 'শিকল' ছিঁড়ে বেরিয়ে আসেন। তাতেও কিন্তু দমে যাননি তৃণমূলনেত্রী। পাহাড়ের মানুষ বলছে মোর্চাকে দুর্বল করতে মমতা ব্যানার্জী প্রচুর অর্থ বিলিয়েছেন। এতে সদ্য অনুষ্ঠিত পৌর নির্বাচনে নিজের দলের ঝুলিতে মিরিক পৌরসভা দখলের মতো সাফল্য আসে ঠিকই কিন্তু বাকি তিনটিতে পরাজিত হয় তৃণমূল কংগ্রেস। বিমল গুরুং অনেকবার এই অভিযোগ করেছেন যে চুক্তি অনুযায়ী জিটিএ-কে সমস্ত ক্ষমতা হস্তান্তর করা হচ্ছে না। জেলা প্রশাসন দিয়েই মুখ্যমন্ত্রী দার্জিলিং সামলাচ্ছেন। এই প্রেক্ষাপটে মোর্চাকে দুর্বল করতে ও জিটিএ-র প্রাসঙ্গিকতা আরও কমিয়ে আনতে লেপচা-ভুটিয়া-তামাংদের মতো বিভিন্ন সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে নানাভাবে প্রলোভিত করে প্রত্যেকের জন্য পৃথক উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করেছেন। একই এলাকায় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য পৃথক উন্নয়ন বোর্ড ভবিষ্যতে পাহাড়ের মানুষের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও স্থায়ী লড়াইয়ের বাতাবরণ তৈরি করবে এই আশঙ্কা করছেন পাহাড়ের চিন্তাশীল মহল। এখনো পর্যন্ত এরকম ১৫টি উন্নয়ন পর্ষদ গঠিত হয়েছে। আর্থিক দৈন্যদশায় ভুগতে থাকা রাজ্য কোষাগার থেকে ১৫টি উন্নয়ন পর্ষদের জন্য এখনো পর্যন্ত ২৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। সুভাষ ঘিসিংয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই বিমল গুরুং ও রোশন গিরিরা জিটিএ পরিচালনা করছিলেন। এই নিয়েও পাহাড়বাসীর মনে ক্ষোভের সঞ্চার হচ্ছিল। ফলে পাহাড়ের রাজনীতির প্রচলিত নিয়মেই বিমল গুরুং দ্রুত কোণঠাসা হয়ে পড়ছিলেন। পোড়খাওয়া রাজনীতিক মমতা ব্যানার্জী এই সুযোগকে হাতছাড়া করেননি। রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত সমস্ত প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে পাহাড়ে নিজের দলের রাজনৈতিক জমি দখলই হয়ে ওঠে দার্জিলিং নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর যাবতীয় সক্রিয়তার কেন্দ্রবিন্দু।

পাহাড়ের স্বঘোষিত বাদশা হয়েও বিরোধী মুক্ত রাজনীতিতে অভ্যস্ত কোণঠাসা বিমল গুরুংয়ের পক্ষে কোনোভাবেই মমতা ব্যানার্জীর এই রাজনৈতিক আগ্রাসনকে রুখে দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। এই পরিস্থিতিতে দু' মাস বাদে অনুষ্ঠিত হতে চলা জিটিএ নির্বাচনের আগে দু'পক্ষই পরস্পরের উপর চরম আঘাত হানার ছক কষবেন এটাই স্বাভাবিক। 'অডিট ও জেলের ভয়' নামক যে ব্রহ্মাস্ত্র দেখিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সমতলে বিরোধী দলের দখলে থাকা বিভিন্ন পৌরসভা, পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি একের পর এক দখল করে তৃণমূলের ঝুলিতে পুরেছেন, জিটিএ-র হিসেব খতিয়ে দেখার নামে দার্জিলিংয়ে উচ্চপর্যায়ের অডিট টিম পাঠানোর কথা ঘোষণা করে বিমল বধের উদ্দেশে সেই একই অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। অনেকেই বলছেন সরকার টাকা দেবে হিসেব চাইবে না? অডিট করানো একটি স্বাভাবিক প্রশাসনিক প্রক্রিয়া। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে ২০১১ সালে জিটিএ গঠনের পরে এতগুলি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল মুখ্যমন্ত্রী অডিটের কথা তুললেন না কেন? হঠাৎ করে নির্বাচনের আবহে রাজনৈতিক উত্তাপের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর জিটিএ-র অডিটের কথা মনে পড়ে গেল? কোনো সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে যে মুখ্যমন্ত্রী এই ঘোষণা করেননি এটা বুঝতে পণ্ডিত হওয়ার দরকার নেই। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করে দিলেন রাজ্যের সমস্ত স্কুলে বাংলা ভাষাশিক্ষা বাধ্যতামূলক। ঘুরে দাঁড়ানোর ইস্যু পেয়ে গেলেন বিমল গুরুং। কালবিলম্ব না করে নেপালিভাষীদের উপর বাংলাভাষা চাপিয়ে দেওয়ার অভিযোগ তুলে অসন্তোষ জাগিয়ে তুললেন পাহাড় জুড়ে। এই অসন্তোষের আঁচ পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী মিরিকে এসে প্রকাশ্যেই ঘোষণা করলেন পাহাড়ে বাংলাভাষা হবে 'অপশনাল'। মোর্চা এই ব্যাপারে সরকারি নির্দেশনামা ও মন্ত্রীসভার দার্জিলিং বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দাবি জানায়। মুখ্যমন্ত্রীর কাজের ধরন থেকে এটা স্পষ্ট তিনি মনে করেন এই বাংলায় তিনিই শেষ কথা এবং তাঁর মুখের কথাই আইন। ফলে ভাষার ব্যাপারে মোর্চার লিখিত বিবৃতির দাবি উড়িয়ে দিলেন।

৮ জুন বৃহস্পতিবার ভাষা নিয়ে মোর্চা

ছাড়াও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিবাদে শামিল হয়েছিলেন পাহাড়ের শিক্ষক, অধ্যাপক, গৃহবধু, ট্যাক্সি ড্রাইভার থেকে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ। অহমিকা ত্যাগ করে মুখ্যমন্ত্রী ইচ্ছে করলেই বিমল গুরুং-সহ পাহাড়ের বিশিষ্টজনদের ডেকে নিয়ে নেপালিভাষীদের মধ্যে জোর করে বাংলা ভাষা চাপিয়ে দেওয়া হবে না এই মর্মে লিখিত বিবৃতি দিয়ে উত্তেজনা প্রশমিত করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে তিনি প্রতিবাদীদের উচিতশিক্ষা দেওয়ার জন্য পুলিশ দিয়ে বলপ্রয়োগ করে কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটিয়ে প্রতিবাদকে দমিয়ে দেওয়ার পথে হাঁটলেন। বৈঠকে আগত মন্ত্রী মহোদয়দের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পথঘাট বন্ধ করে দিয়ে পাহাড়ের মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিঘ্নিত করে আরও খেপিয়ে তুললেন মানুষকে। অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল পাহাড়। রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠক চলাকালীন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো বিদ্রোহের আগুন। প্রশাসনের মুখের উপর জ্বলল পুলিশের গাড়ি। বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল রাজ্য প্রশাসন। চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ল মুখ্যমন্ত্রীর অহমিকা। নামলো সেনা। জেগে উঠলো গোর্খাল্যান্ড নামক ঘুমন্ত দৈত্য।

পরের দিন অর্থাৎ ৯ জুন মোর্চার ডাকা বন্‌ধকে চ্যালেঞ্জ জানাতে তিনি কোনো হুমকিকে ভয় পান না এটা প্রমাণ করার জন্য পর্যটকদের উদ্ধারের নামে নিজে মাইক হাতে নিরাপত্তারক্ষী ও একান্ত অনুগত পার্টিকর্মী বেষ্টিত হয়ে ঘুরলেন দার্জিলিংয়ের রাস্তায়। সমতলের মানুষ বাহ্ বাহ্ দিয়ে মুগ্ধ হয়ে মমতা ব্যানার্জীর সাহসিকতা দেখলেও মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এই আচরণকে পাহাড়বাসী ঔদ্ধত্যের চরম বহিঃপ্রকাশ বলেই ধরে নিয়েছে। যা কিনা গোর্খাল্যান্ডের সেন্টিমেন্টের আগুনে বাড়তি ঘৃতাহুতির কাজ করেছে। ১৯৭২ সালে নকশাল আন্দোলনে উত্তাল উত্তরবঙ্গ কত শান্ত এটা প্রমাণ করতে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ও দার্জিলিংয়ে মন্ত্রীসভার বৈঠক করেছিলেন। ৪৫ বছর পরে গত ৮ জুন দার্জিলিংয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রীসভার বৈঠককে মমতা-অনুগামী মিডিয়া যতই ইতিহাস সৃষ্টিকারী পদক্ষেপ বলে ভূষিত করে সমতলের মানুষের কাছে বাহবা কুড়োনোর প্রয়াস করুক না কেন পাহাড়ের মানুষ কিন্তু ভাষা নিয়ে উত্তপ্ত পরিবেশে এই বৈঠকটিকে পাহাড়ের সেন্টিমেন্টের বিরুদ্ধে সরাসরি চ্যালেঞ্জ হিসেবেই দেখেছে। স্বাভাবিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলে হয়তো সমস্ত পাহাড় এই ধরনের বৈঠককে স্বাগত জানাতো। কিন্তু মোর্চার পক্ষেও জিটিএ নির্বাচনের আগে সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য মন্ত্রীসভার বৈঠকের মোড়কে তৃণমূলের এই কর্মসূচিকে হজম করা কঠিন ছিল। পাহাড়ের চিন্তাশীল মানুষ কিন্তু উত্তপ্ত পরিবেশে মন্ত্রীসভার বৈঠকের সিদ্ধান্তকে কোণঠাসা মোর্চা সমর্থকদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক হয়ে ওঠার পেছনে প্ররোচনা হিসেবেই দেখছে।

কথায় কথায় শেষ দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়ে, নিজের 'রাফ অ্যান্ড টাফ' ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করতে রাতারাতি পাহাড়ে বাঘা বাঘা পুলিশ অফিসারদের পোস্টিং দিয়ে, পাহাড় জুড়ে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দিয়ে, স্থানীয় মিডিয়াকে স্বাধীন ভাবে কাজ করতে না দিয়ে, বিমল গুরুংয়ের অফিস বাড়িতে পুলিশি অভিযান করিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সমতলের তাঁবেদার মিডিয়ার বাহবা কুড়োলেও এই ধরনের পদক্ষেপ পাহাড়ের আবেগে যে কতটা গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে তা কিন্তু লক্ষ্য করলেন না। সিঙ্গুর নন্দীগ্রামে পুলিশ পাঠিয়ে মানুষের আন্দোলনকে গুঁড়িয়ে দিয়েও মমতার পূর্বসূরি বুদ্ধদেববাবুও অনুভব করতে পারেননি কতখানি আহত হয়েছিল মানুষের সেন্টিমেন্ট। বিশেষ করে ১৭ জুন কাদের গুলিতে তিন জন (মতান্তরে চার জন) প্রতিবাদীর মৃত্যু হয়েছে এই প্রশ্নের উত্তর পেতে মোর্চার তরফে সিবিআই তদন্তের দাবি নস্যাৎ করে দিয়ে এক তরফা ভাবে বিমল গুরুংদের বিরুদ্ধে যেভাবে খুনের মামলা করিয়ে দিলেন তাতে কিন্তু পাহাড়বাসীর ক্ষোভ এখন চরমসীমায়। এই ক্ষোভের ধাক্কায় এক লহমায় পাহাড় থেকে তৃণমূল নিশ্চিহ্ন হওয়ার মুখে।

তৃণমূলনেত্রী পাহাড় দখলে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। কারণ তিনি জানতেন একবার বিমল গুরুংদের গুঁড়িয়ে দিয়ে পাহাড় দখল করতে পারলে পশ্চিমবঙ্গে তাঁর কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করার মতো আর কেউ থাকবে না। বিজেপির হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া যাবে দার্জিলিং লোকসভা আসন। বাঙালির স্বপ্নের পাহাড় জয়ের কৃতিত্বে বাঙালির হৃদয়ের সম্রাজ্ঞী হয়ে তছনছ করে দেওয়া যাবে মূর্তিমান বিপদ বিজেপির জয়যাত্রা। নেত্রীর এই অসৎ উদ্দেশ্য সফল করতে পাহাড় থেকে জনবিচ্ছিন্ন কিছু ধান্দাবাজ নেপালিকেও পেয়ে গিয়েছিলেন। যাদের মাধ্যমে দেদার টাকা ছিটিয়ে মিরিক পৌরসভা দখল করে ধরেই নিয়েছিলেন কেল্লাফতে। এবার অডিটের নামে বিমল গুরুংকে জেলে পুরতে পারলেই আর পিছন ফিরে তাকাতে হবে না। এক সময় কংগ্রেস ছিল আঞ্চলিক আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রতীক। পরিবারের সীমানায় আবদ্ধ হয়ে কংগ্রেস যত দুর্বল হয়েছে ততই মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে আঞ্চলিক আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রতীক আঞ্চলিক দলগুলি। মণিপুর ও অসমে ক্ষমতা দখল ও উত্তরপ্রদেশে মায়াবতী মুলায়মের মতো আঞ্চলিক শক্তির দুর্বল হওয়া প্রমাণ করে যে জাতীয় দল হিসেবে এখন বিজেপি ক্রমশই আঞ্চলিক আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রতীক হয়ে উঠছে। এই দিক দিয়ে বিশ্লেষণ করলে বলতে হবে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সঙ্গে বিজেপির মতো জাতীয় দলের সম্পর্ক স্বাভাবিক উপাদান দিয়েই তৈরি। তৃণমূলের মতো একটি আঞ্চলিক দলের পক্ষে আরেকটি আঞ্চলিক দলের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রতীক হয়ে ওঠা অসম্ভব ব্যাপার। আশঙ্কার বিষয় হলো, পাহাড়ে নিজের জ্বালানো আগুনে হাত পুড়িয়ে তৃণমূলনেত্রী প্রতিদিনই একবার করে বলছেন শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে বাংলা ভাগ রুখবেন। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সঙ্গে আঁতাত করে তৃণমূল নির্বাচনে লড়েছিল। তৃণমূল নেত্রী দিনের পর দিন বিমল গুরুংয়ের সঙ্গে মঞ্চ আলো করে বসে হাসি হাসি মুখে ছবি তুলেছেন। আবেগে আপ্লুত বিমলও মমতাকে মা বলে সম্বোধন করেছেন আর এখন নিজের অপকীর্তি ঢাকতে বশংবদ মিডিয়াকে দিয়ে প্রচার করাচ্ছেন বিমল গুরুং সন্ত্রাসবাদী, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা উত্তরপূর্বের সন্ত্রাসবাদী দলের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে পাহাড়ে দেশবিরোধী ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত। তবে যাই হোক, পাহাড় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী গরম গরম ভাষণ দিয়ে সমতলে হাততালির সঙ্গে সঙ্গে নিজের দলের ভোটব্যাঙ্ক স্ফীত করার প্রয়াস করে যাচ্ছেন ঠিকই, তবে এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপে বাঙালি-নেপালি ফাটল চওড়া হয়ে পাহাড় কিন্তু ক্রমেই মানসিক ভাবে বাঙলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে স্বাধীনতার প্রাক্কালে কংগ্রেস নেতারা যেভাবে ক্ষমতা লাভের নেশায় মত্ত হয়ে পরিস্থিতিকে দেশভাগের দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন স্বাধীনতার প্রায় সাত দশক পরে সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে। ▮

গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন—উৎস ও সম্ভাবনা

কে. এন. মণ্ডল

বহুকাল ধরে দার্জিলিং পাহাড়ে বসবাসকারী মানুষরা গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে লড়াই করছেন। একথা সত্য যে ভৌগোলিক বা রাজনৈতিক ভাবে বিংশ শতাব্দীর আগে দার্জিলিং পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল না।

ঐতিহাসিকভাবে দার্জিলিং পাহাড় সিকিমরাজের অধীন ছিল। এখানে বসতি স্থাপন করেছিল নেপালের গোর্খারা। উপজাতি লিম্বু, রাই, মগর, তামাং, গুরুং, লেপচা, শেরপা, নেওয়ার ও ভুটিয়ারা তো ছিলই। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে নেপালের গোর্খারা বারবার আক্রমণ সানিয়ে সিকিমের চোগিয়াল সাম্রাজ্য থেকে দার্জিলিং এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা দখল করে নেয়।

গোর্খাদের অব্যাহত অভিযানে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শঙ্কিত হয় এবং তাদের অগ্রগতি ঠেকাতে গোর্খাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয় যাতে গোর্খারা উত্তর সীমান্ত পর্যন্ত দখল করতে না পারে। পরাজিত গোর্খারা ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে Singuli Treaty-র মাধ্যমে সমস্ত দখলীকৃত জমি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ফেরত দেয়।

১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একটি প্রতিনিধিদল দার্জিলিংকে 'ব্রিটিশ সেনাদের জন্য একটি স্বাস্থ্য নিবাসের' উপযুক্ত জায়গা হিসেবে মনে করে দার্জিলিং পাহাড়টিকে চোগিয়ালদের কাছ থেকে লিজ নেয়। ব্রিটিশরা দার্জিলিং শহরকে একটি হিল স্টেশন হিসেবে গড়ে তুলতে ব্রতী হয় তাদের দেশীয়দের সমতলের প্রখর গরমের হাত থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য এবং ১৮৬৪ সালে দার্জিলিংকে Summer Capital হিসেবে ঘোষণা করে। দার্জিলিং শহরকে আধুনিক এবং বাসযোগ্য করার জন্য ১৮৫০ সালে Darjeeling Municipality-এর জন্ম হয়।

১৯৪৭ সালে খণ্ডিত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের পরে দার্জিলিংকে পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর ফলে Non-regulated District বা Excluded Area হিসেবে দার্জিলিংয়ের যে বিশেষ অবস্থান ছিল তাও অন্তর্হিত হয় এবং পাহাড়বাসীর স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের স্বপ্ন হোচট খায়। নেপালিরা একটি 'আলাদা ভাষাগোষ্ঠী' হিসেবে স্বীকৃতি পায় ১৯৬১ সালে, যা তাদের আলাদা রাজ্যের স্বপ্নকে জোরালো করে। ১৯৭৫ সালে সিকিমকে একটি আলাদা রাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার পর থেকে গোর্খাল্যান্ডের আন্দোলন দানা বাধে এবং ১৯৮৬-১৯৮৮ সালের হিংসাশ্রয়ী আন্দোলনের ফলশ্রুতি Darjeeling Gorkha Hill Council (DGHC)।

কিন্তু ১৯৮৮ সালে DGHC গঠিত হলেও গোর্খাদের মূল দাবি 'গোর্খাল্যান্ড' মাঝে মধ্যেই মাথা চাড়া দেয়। প্রায় দুই দশক আপেক্ষিক শান্তির পর দার্জিলিংয়ের আকাশে ফের মেঘের ঘনঘটা দেখা দেয় এবং 'গোর্খাজনমুক্তি মোর্চা' নামে একটি সংগঠন বিমল গুরুংয়ের নেতৃত্বে পুনরায় 'গোর্খাল্যান্ড' আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আন্দোলন শীঘ্রই গতি পায় এবং GJM পাহাড় এবং সমতলের কিছু এলাকায় পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করে। জনমুক্তি মোর্চার ডাকে মুহূর্তেই পাহাড় নিস্তব্ধ হয়ে যায়, এমনকী সিকিমের সঙ্গে যোগাযোগের হাইওয়েও বন্ধ হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার আরো বেশি স্বায়ত্ত শাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ২০১১ সালের ১৮ জুলাই গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সঙ্গে Gorkhaland Territorial Administration (GTA) চুক্তি সম্পাদন করে। চুক্তিতে গোর্খাল্যান্ড শব্দটিই পরোক্ষে গোর্খাল্যান্ডের স্বীকৃতির নামান্তর।

বছর যেতে না যেতেই গোর্খাজনমুক্তি মোর্চা জিটিএ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করতে থাকে এবং চুক্তি অনুযায়ী জিটিএ প্রাপ্য মর্যাদা বা ক্ষমতা পায়নি বলে অভিযোগ তোলে। মোর্চা গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে ফের আন্দোলন শুরু করে এবং জিটিএ-কে একটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে বর্ণনা করে। কেন্দ্রীয় সরকারের তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠনের ঘোষণা ঘৃতে অগ্নিসংযোগের কাজ করে।

এটা ঠিক যে সমতলবাসী গোর্খাল্যান্ডের ব্যাপারে যতই বিরুদ্ধচারণ করবেন, ততই পাহাড়বাসীরা গোর্খাল্যান্ডের ব্যাপারে দৃঢ় মনোভাব নেবেন। সমতলের তীব্র বিরোধিতাকে পাহাড়বাসীর উপর সমতলের 'কর্তৃত্বের ইচ্ছা বা Hegemonical mindest' হিসেবে ধরে নেবে। দার্জিলিং পাহাড়কে রাজ্যের মর্যাদা দিলে, ভ্রমণপ্রিয় বাঙালি দার্জিলিং পর্যটন কেন্দ্র হারাবে, এই প্রচারের সারবত্তা কতটুকু তা ভ্রমণপ্রিয় বাঙালি যাঁরা সিকিমে বেড়াতে যান, তাঁরাই ভাল বলতে পারবেন। সত্যি কথা বলতে কি, আমার কাছে সিকিম অনেক বেশি আপন ও নিরাপদ মনে হয়।

আসলে 'গোর্খাল্যান্ড' ধারণাটা পাহাড়বাসীর সংস্কৃতির সঙ্গে সমার্থক হয়ে গেছে। 'গোর্খাল্যান্ড' যেন একটি স্বপ্ন রাজ্য যেখানে সব সমস্যার সমাধান আছে। যদিও প্রতিবেশী ছোট ছোট রাজ্যগুলির অভিজ্ঞতা হতাশাব্যঞ্জক। গোর্খা স্বাভিমান এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বোধই গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের পটভূমি। তাই কোনো Rough & Tough Policy একে অবদমিত করতে পারবে না। মনে রাখতে হবে, Lord Becon-এর পর্যবেক্ষণ 'Force begets force'। কেবলমাত্র গোর্খাদের কাছে গ্রহণযোগ্য সমাধান (রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা বজায় রেখে) দীর্ঘস্থায়ী শান্তি এবং প্রগতি নিশ্চিত করতে পারে। রাজনৈতিক প্রতিশোধ বা বিভাজন সমস্যাটিকে তীব্রতর করবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, গোর্খারা ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত এবং আবেগতাড়িত। সাধারণভাবে তারা কোনো দেশদ্রোহী বা Subversive কাজে যুক্ত নয়। তাই সব পক্ষকে মনে রাখতে হবে যে, ভারতের অখণ্ডতায় বিশ্বাসী এমন একটি জাতিকে এবং তিনদিকে পাহাড় ও বিদেশী রাষ্ট্রের সীমানাঘেরা দূরতিক্রম্য স্পর্শকাতর দার্জিলিং পাহাড়কে অবিশ্বাস আর শক্তি প্রদর্শনের দ্বারা শত্রু শিবিরের দিকে ঠেলে না দেওয়া হয়।

(লেখক ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত বরিষ্ঠ আধিকারিক)

জিএসটি এক র‍্যাডিক্যাল রিফর্ম যা মুদ্রাস্ফীতিতে লাগাম পরাবে

কুনাল চট্টোপাধ্যায়

অবশেষে শুরু হলো জি এস টি যুগ। যা গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্স হিসেবে পরিচিত। বিভিন্ন মহল থেকে এটিকে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। অনেক দিক থেকেই এটির সঙ্গে ১৯৯১-এর অর্থনৈতিক সংস্কারকে তুলনা করা যায়। বিশ্ব বাণিজ্যের অঙ্গনে উরুগুয়ে রাউন্ডে ডাঙ্কেল খসড়া ও তারপর গ্যাট-এর পরিবর্তে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) গঠনে ভারতের শামিল হওয়াটা যত না পছন্দের বা ঐচ্ছিক ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল তাতে বাধ্যবাধকতা। সর্বশেষ স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে ভারতের দোলাচলের প্রশ্নে এমন প্রশ্নেরও মুখোমুখি হতে হয়েছিল যে সংরক্ষণের পাঁচিল না সরালে শাবল দিয়ে তা ভাঙা হবে।

জি এস টি-র প্রশ্নেও তামিলনাড়ু ব্যতীত সব রাজ্যের বিধানসভাতেই তা গৃহীত হয়েছে। এমনকী জম্মু-কাশ্মীরেও এটি গৃহীত হতে চলেছে।

গ্যাট চুক্তি বাতিলের দাবিতে তদানীন্তন বামফ্রন্ট কলকাতা শহরের সব দেওয়াল ভরিয়ে দিয়েছিল স্লোগানে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী চিল চিৎকার করে বলছেন জুলাই থেকে জি এস টি লাগু হওয়াটা এপিক ব্লান্ডার। নোটবন্দির সময়েও তিনি বলেছিলেন ডিমনিটাইজেসন মানে ভবিষ্যতের দুর্ভিক্ষ। বলা বাহুল্য, জি এস টির বিরোধিতার ক্ষেত্রেও তিনি সারা দেশে এক এবং অদ্বিতীয়া।

এক দেশ এক আইনের দাবিদার ভারতীয় জনতা পার্টি অন্তত এক দেশ এক কর নীতি চালু করতে পেরেছে। ভারতের মতো বিশাল ও বৈচিত্র্যের দেশে একাজ মোটেই সহজ নয়। আশা করাই যায় ভবিষ্যতে এক শিক্ষা নীতিও লাগু হওয়া কষ্টকল্পিত হবে না।

আমাদের দেশে করকাঠামোর দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা ও করসংগ্রহের দুর্বলতা সুবিদিত। কর পাত, বিশেষ করে অতি উচ্চ আয়কর ও এর খাতের বিচারেও ভারত পরিচিত। জটিল করব্যবস্থার দরুন কর ফাঁকি ও কালোটাকা



এখানে সমার্থক। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে নিকোলাস কলডরকে কর সংস্কারের উদ্দেশে এদেশে ডাকা হয়েছিল। তিনি এক্সপেন্ডিচার ট্যাক্স-এর সুপারিশ করলেও লাইসেন্স-পারমিট- কোটা রাজের স্বর্ণযুগে তা কার্যকর হয়নি। ড. মনমোহন সিংহ অভিন্ন কর কাঠামোর পক্ষে সওয়াল করলেও দু' দফার প্রধানমন্ত্রিত্বে তেমন কিছু করতে পারেননি। ২০০০ সালে প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর আমলে এই উদ্দেশে একটি এমপাওয়ার্ড কমিটি গঠিত হয়। যার সফল পরিণতি ২০১৭-র মধ্যরাতের ঘোষণা।

দেখা যাক এই জি এস টি কী? এক কথায় বলা যায় পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে এটি হলো এক এবং অভিন্ন হারের প্রয়োগ যা কিনা রাজ্য ভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন করের হার ও অক্টয়ের মতো অবাঞ্ছিত উৎপাত থেকে উৎপাদক, বিক্রেতা এমনকী ক্রেতাকেও যথেষ্ট সুরাহা দেবে।

একটা কাল্পনিক হিসেবে মনে করা যাক, কোনো হোসিয়ারি প্রস্তুতকারক ১০ শতাংশ কর দিয়ে ১০০ টাকার উপাদান কিনে ৩০ টাকা মূল্য সংযোগ করল এবং তা কোনো পাইকারি বিক্রেতাকে বিক্রয় করল। সেই পাইকার ও পরবর্তীকালে খুচরো বিক্রেতা যদি যথাক্রমে ২০ ও ১০ টাকা করে মূল্য সংযোগ করে, তা হলে প্রত্যেক স্তরে ১০ শতাংশ করে কর দিলে মোট দেয় করের পরিমাণ হবে ৫৪ টাকা। অন্যদিকে, জি এস টি প্রয়োগে করের মোট পরিমাণ হতে পারে ১৬ থেকে ২৮ টাকা। করের এই সংখ্যাটি নির্ভর করবে দ্রব্য ও সেবার চরিত্রের ওপর। এতদিন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাড়ে বারো শতাংশ অন্তঃশুল্ক ও রাজ্যের সাড়ে চোদ্দ শতাংশ ভ্যাট চালু ছিল। তার ওপর খুচরো কর ও সেস সমেত করের হার প্রায় ৩০ শতাংশ ছাড়াতো।

এই নতুন কর ব্যবস্থা কেবল সরলই নয়, অন লাইন প্রযুক্তি নির্ভর বলে অনেক গুণ আর্থিক ও সময় সাশ্রয়ও হবে। এছাড়া এর ফলে করের হার কমলেও অন্তত পাঁচ থেকে ছয় গুণ বেশি লোক এই করের বন্ধনীতে আসবে। বাড়বে কর্মসংস্থান, অর্থনীতিতে স্বচ্ছতা ও বিদেশি লগ্নির হারও।

যেটা লক্ষণীয় তাহলো এই জি এস টি-র মধ্যে কেন্দ্রের কর চাপানোর একচেটিয়া ক্ষমতা থাকবে না। প্রস্তাবিত জি এস টি কাউন্সিলের দুই তৃতীয়াংশ ভোটাধিকারও এদেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ব কাঠামোর ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বড় রূপান্তর।

জি এস টি-র ক্ষেত্রে অন্য একটি যুক্তি হলো, অভিন্ন করের হার হলে রাজ্য সরকারগুলোর মধ্যে নিজের রাজ্যে পুঁজি টানার জন্য একে অপরের তুলনায় করের হার কম করার প্রতিযোগিতা রোধ করা যাবে।

এখানে বলা দরকার, জ্বালানি তেল ও বিদ্যুতের মতো পণ্য দুটি আপাতত জি এস টি-র আওতার বাইরে রয়েছে। অন্যদিকে ৫৫টি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের ওপর কর ছাড় বজায় থাকবে।

এই অভিন্ন পণ্য পরিষেবা করটি কিন্তু একটি ইউনিফর্ম রেট নয়। বরং তিনটি ইউনিফর্ম রেট : স্টেট জি এস টি, সেন্ট্রাল জি এস টি এবং ইন্টার স্টেট জি এস টি।

এটা বলাই যায়, জি এস টি-র মতো র‍্যাডিক্যাল রিফর্ম (মৌলিক সংস্কার) না আনলে ট্যাক্স টেররিজম বা মুদ্রাস্ফীতিতে লাগাম পরানো কঠিন। সেই সঙ্গে এটাও দেখার, মাত্র আট শতাংশ সংগঠিত ক্ষেত্রে থাকা যে দু/তিন শতাংশ মানুষ উৎস থেকেই কর দিয়ে আয় করে, তাদের মতো কত শতাংশ অসংগঠিত ক্ষেত্রের মানুষকে এই বিস্তৃত করের জালে জি এস টি যুগ আনতে পারে।

জি এস টি চালু সাধারণ মানুষের স্বস্তির পদক্ষেপ

দেবব্রত চৌধুরী

দেশে এতদিন বিভিন্ন রাজ্যে নানা রকম ট্যাক্স ছিল, জনগণ হতো বিভ্রান্ত। যেমন ভ্যাট-সার্ভিসেস-এন্ট্রি-পারচেজ ক্যাশ-স্যাড আরও নানারকম ট্যাক্স যা সবসময় বোধগম্য হতো না। অসাধু ব্যবসায়ীরা এর সুযোগ নিতেন। মোদী সরকার ঘোষণা করল— এক দেশ, এক বাজার, এক কর— যা আমজনতা সহজেই জানতে পারবে। এর আগে মহারাষ্ট্রে



উৎপাদিত দ্রব্য অসমে রপ্তানি করতে প্রায় ৮টি 'চেকপোস্ট' পার হতে হতো। প্রতিটি চেকপোস্টে বিভিন্ন রকম ট্যাক্সের জ্বালায় ট্রাক মালিকরা অতিষ্ঠ হয়ে যেতেন। ঠিক সময় এই সব বাধা পেরিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে মাল পৌঁছতে পারতেন না। কিন্তু জিএসটি চালু করতে এসব বাধাগুলি প্রায় নির্মূল হয়ে যাবে। ব্যবসায়ীরা দেশে ট্যাক্স- জালের সুযোগ নিয়ে জনগণকে ঠকিয়ে পয়সা কামাতেন। তাই তারা এবং তাদের দয়ায় চলা রাজনৈতিক দলগুলি গেল গেল রব তুলেছে। এক নজরে দেখা যাক জিএসটি চালু করায় কী কী সুবিধা হচ্ছে জনগণের। জনগণের দৈনন্দিন ব্যবহারযোগ্য ৫০ শতাংশ কৃষিজাত দ্রব্যের উপর কোনো ট্যাক্স নেই। অর্থাৎ দেশের মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলির প্রসার করার জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের কোনো অ্যাকাউন্ট অডিট করার মতো ঝামেলার প্রয়োজন নেই। যাঁরা আগে ১০ লাখ টাকার বাৎসরিক ব্যবসার উপর সার্ভিস ট্যাক্স দিতেন জিএসটি চালু হবার পর এই ব্যবসা দ্বিগুণ অর্থাৎ ২০ লাখ অবধি ব্যবসা হলে ট্যাক্সের ঝামেলায় পড়তে হবে না। আমজনতার সংসারে যেখানে নিত্য দরকারি দ্রব্যের উপর আগে ১৪.৫০ শতাংশ ট্যাক্স ছিল সেখানে এখন দিতে হবে মাত্র ৫ শতাংশ। যেমন— পোশাক (১০০০ মূল্য পর্যন্ত), জুতা (৫০০ টাকা পর্যন্ত), কাজু বাদাম, কিশমিশ, ভোজ্য তেল, চা, চিনি, কয়েল ম্যাট, ধূপ, শিশুদের দুগ্ধজাত খাবার ইত্যাদি।

নিম্ন আয় গ্রুপের মানুষের যা জীবন ধারণের জন্য নিত্য প্রয়োজন হয় তা মোটামুটি ৫ শতাংশের মধ্যে থাকবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার-সহ যারা এই জিএসটি-র বিরোধিতা করছে তাদের রাজ্যে এই কর লাগু হলে প্রায় বাৎসরিক ৬ হাজার কোটি টাকা আয় বেড়ে যাবে। জিএসটি চালু হলে বাজারে জিডিপি বেড়ে যাবে, করের বোঝাও ধীরে ধীরে কমে যাবে। আর ব্ল্যাকমানির কেরামতিও বন্ধ হবে। এর মধ্যে সুইজারল্যান্ডে আগে যে ভাবে দেশের টাকা ব্ল্যাকমানি রূপে ব্যাঙ্কে জমা পড়ত তা গত সপ্তাহের পর অনেক কম পড়েছে। ওখানকার খবর অনুযায়ী জিএসটি চালু হলে শিল্পের উন্নতি হবে। ৬ জুলাই আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী গাড়ি শিল্পের প্রভূত উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আনন্দবাজার লিখেছে, 'দাম কমছে গাড়ির'। টাটা ও রেনো ইন্ডিয়া গাড়ির দাম কমাচ্ছে প্রায় ১২ শতাংশ। ফলে বিভিন্ন মডেলের গাড়ির দাম কমছে ৩৩০০ থেকে ২,১৭,০০০ টাকা পর্যন্ত। টাটা গাড়ি বিভাগের প্রেসিডেন্ট ময়াঙ্ক পারিক বলেছেন, জিএসটি চালু হতে আমাদের সুবিধা হচ্ছে এবং ক্রেতারাও উপকৃত হবেন। এমনকী ফরাসি বহুজাতিক সংস্থা রেনার গাড়ির দাম কমছে ৫২০০ টাকা থেকে ২৯০০০ টাকা পর্যন্ত। ডাশার কোম্পানির গাড়ির দাম কমে যাচ্ছে ৩৩৪০০ থেকে ১,০৭,৪০০ টাকা পর্যন্ত। আশা করা যাচ্ছে দেশের জিডিপি ১.৫ শতাংশ থেকে ২ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। অচিরেই দেশের সাধারণ মানুষ জিএসটি-র সুফল পাবে।

কিছু বিরোধী দল জিএসটি চালু করার জন্য মোদীজীকে একনায়কতান্ত্রিক বলে নিন্দা করে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। যা সর্বৈব মিথ্যা এবং প্রতিবাদযোগ্য। বরং এই দলগুলি মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে এবং জনগণকে আসল খবর জানতে দিচ্ছে না। জিএসটি কাউন্সিল একটি গণতান্ত্রিক মনোভাব সম্পন্ন সংস্থা। এই সংস্থার চেয়ারম্যান কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী কিন্তু কার্যকারী সদস্য হলেন প্রতিটি রাজ্যের অর্থমন্ত্রীরা। দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় কোনো বিল পাশ করাতে চাইলে কাউন্সিলের দুই তৃতীয়াংশ মানে ২/৩ সভ্যের সমর্থন চাই। খবর অনুসারে এই কাউন্সিলের প্রায় ২৮টি মিটিংয়ের পর এই বিল পাশ হয়েছে। এই কাউন্সিলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তারা সহমত না থাকলে এই বিল পাশ করানো মুশকিল ছিল। অথচ রাজ্যে এসে মিডিয়াতে এর বিরুদ্ধে তিনি বক্তব্য রেখেছেন। এ জাতীয় দ্বিচারিতা সত্যি নিন্দনীয়।

এবার কলকাতায় এসে রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জী এক সভায় ঘোষণা করলেন, 'আমি অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন ২০১১ সালে এই বিলটি পাশ করতে চেয়েছিলাম। কারণ সেই সময়কার প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংহ এই আইনটি দেশে লাগু করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইউপিএ সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ না থাকার জন্য পাশ করানো যায়নি। কিন্তু বর্তমান অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি এই জরুরি বিলটি পাশ করাতে পেরেছেন। আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।' ▮

আমাদের রাজনৈতিক নেতারা ধর্মীয় আবেগকে কাজে লাগিয়ে ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করতে চায়

ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

সম্প্রতি এক বাংলা দৈনিকে শ্রদ্ধেয় মতিলাল মণ্ডলের একটা লেখা পড়েছি। তিনি জানিয়েছেন, ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বরে অযোধ্যার বাবরি মসজিদ ভেঙেছিল বিজেপি-র কর্মীরা। আমরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধের মাধ্যমে জানাতে পেরেছি যে ওই বক্তব্যটা ঠিক নয়। যেটার ওপরের অংশ ভাঙা হয়েছিল, সেটা ছিল আসলে 'রামমন্দির'— তার কিছুটা ভেঙে বাবরের আমলে মসজিদ বানানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। সুতরাং বলা যায়— আদৌ কোনো মসজিদই ভাঙা হয়নি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন প্রধান ড. মাখনলাল রায়চৌধুরী লিখেছেন, 'বাবর অযোধ্যা বিজয়ের পরে শ্রীরামচন্দ্রের বাসভূমি অযোধ্যায় মন্দির ধ্বংস করেন এবং উহার উপর মসজিদ নির্মাণ করেন— (ভারতবর্ষের বৃহত্তর পরিচয়, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৯)। অনুরূপভাবে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক কে.এস. পাল জানিয়েছেন, বাবর তাঁর সেনাপতি মহম্মদ বাকির মাধ্যমে মন্দিরটি ভেঙে মসজিদে রূপ দিতে চেয়েছিলেন— 'In 1528-9 Baqui, a Mughal commender, by Babar's order, destroyed the temple of Ayodhya commending Lord Ram's birthplace'— (মুসলিম স্টেট ইন ইন্ডিয়া, পৃ. ৬৫৬)। বরেণ্য ঐতিহাসিক ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদারও ওই মত ব্যক্ত করেছেন— (দ্রষ্টব্য, তাঁর গ্রন্থ, ভারতীয় বিদ্যাভবন প্রকাশিত দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩০৭)। বাংলাদেশের ঐতিহাসিক জাহান আয়েসা সিদ্দিকাও এই বক্তব্য সমর্থন করে লিখেছেন, এক লক্ষ, চুয়াত্তর হাজার হিন্দু রক্তে রঞ্জিত চূর্ণ প্লাস্টার দিয়ে এই কাজ করা হয়েছিল— 'ইসলামী শান্তি ও বিধর্মী, পৃ. ২০)।

সেই মন্দির অবশ্য পুরোপুরি ভাঙা যায়নি—সেটার নীচের অংশ মন্দিরের মতোই রয়ে গেছে। এটাকে রক্ষা করার জন্য ৭৭ বার যুদ্ধ করা হয়েছিল বলে ক্রিস্টোফার জেফিলেট মন্তব্য করেছেন— (দ্য হিন্দু ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্ট অ্যান্ড ইন্ডিয়ান পলিটিক্স, পৃ. ৪০২)। ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ জানিয়েছে যে এখনও সেখানে রামচন্দ্র, সীতা, হনুমানের মূর্তি রয়ে গেছে।

কিন্তু করসেবকরা মসজিদ ধ্বংস করেছেন বলে দেশব্যাপী দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়েছিল, কাশ্মীর ও অন্যত্র শয়ে শয়ে মন্দির ধ্বংস করা হয়েছিল। ভেঙে দেওয়া হয়েছিল বিজেপি শাসিত চারটে রাজ্য সরকারকে। দেশের স্বঘোষিত নেতা ও বুদ্ধিজীবীরা এতে অত্যন্ত উল্লসিত হয়েছিলেন। এক বড় নামী নেতা বলেছিলেন, বিজেপি এক অসভ্য দল, ওরা মসজিদ ভাঙে।

অথচ এখনও কেউ একটা মসজিদও ভাঙেনি। বরং অযোধ্যার ওই ঘটনার পর বাংলাদেশেও অসংখ্য মন্দির ভেঙে দেওয়া হয়েছে— হিন্দুরা এর প্রতিবাদে দুর্গাপুজো না করে 'ঘটপুজো' করেছিলেন। আর আমাদের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ জানিয়েছে— এই দেশে প্রায় ৩৯৯৯৭ টা মন্দির ধ্বংস করা হয়েছে এখনও পর্যন্ত।

কিন্তু আমাদের সহজাত প্রবৃত্তি হলো নিজের মতকে আঁকড়ে ধরা আর পড়ার চেয়ে বেশি বলা বা লেখা। তবে সেই লেখকের একটা কথা ঠিক— আমাদের নেতারা ধর্মীয় আবেগকে কাজে লাগিয়ে ভোট ব্যাঙ্ক তৈরি করতে চান। তাই মহরমে যেমন সশস্ত্র মিছিল হয়, রামনবমীতেও তেমনটাই হয়ে চলেছে। তবে আমরা তার একপেশে নিন্দা করি— কারণটা ভিন্নমুখী। কেউ চান ভোট, কেউ চান সরকারের প্রসাদী বাতাসা। তবে এই প্রসঙ্গে একটা ভ্রান্ত কথা লেখা হয়েছে— ধর্মকে নাকি রাজনীতির সঙ্গে মেলানো উচিত নয়।

আসলে, 'ধর্ম' সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা এখনও বহু শিক্ষিত মানুষের মনে গেঁথে রয়েছে, কারণ ইংরেজি 'religion' অর্থেই আমরা এটাকে বলে থাকি। কিন্তু 'ধর্ম' ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে আদৌ 'religion' নয়, এটা হলো 'ধর্ম'। এটাতে নিজস্ব পুজোপদ্ধতি বা আরাধনা প্রক্রিয়া বোঝায় না— এর দ্বারা বোঝায় ন্যায়, সত্য, প্রকৃতি, আদর্শবোধ, সততা, বিবেক, পবিত্রতাবোধ ইত্যাদি অনেক কিছু। জি.ম্যাকেঞ্জি ব্রাউন মন্তব্য করেছেন, 'By usage, the term is employed in many senses–duty, virtue, religious creed, justice, law'— (দ্য হোয়াইট আম্ব্রেলা, পৃ. ১৫)। আসলে, 'ধর্ম' কথাটা এসেছে সংস্কৃত 'ধৃ' ধাতু থেকে— তার অর্থ ধারণা করা বা রেখে দেওয়া—স্খলন পতন থেকে রক্ষা করা। সুতরাং 'ধর্ম' আমাদের সত্য, সুন্দর, ন্যায়, সততা ও নীতির মধ্যে আটকে রাখে। মহাভারতে আছে— কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যাওয়ার আগে প্রতিদিন কুচক্রী দুর্যোধন তাঁর মায়ের কাছে জয়ী হওয়ার জন্য আশীর্বাদ চাইতেন। কিন্তু গান্ধারী বলতেন 'যতোধর্মস্ততোজয়ঃ'— যেদিকে ধর্ম, তারই জয় হবে।

এক্ষেত্রে কোনো বিশেষ রিলিজিয়ানের কথা বলা হয়েছে? মহাগ্রন্থ 'গীতা' শুরু হয়েছে 'ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে' কথা দিয়েই। কিন্তু সেখানে পুজো-অর্চনা হয়নি— হয়েছে যুদ্ধ, সেটাই ছিল পাণ্ডবদের 'ধর্ম'। অর্জুন জ্ঞাতি হত্যার ভয়ে অস্ত্রত্যাগ করে নিরস্ত্র হয়ে বসেছিলেন বলে কৃষ্ণ শুনিয়েছেন রণধ্বনি— অর্জুনকে ধর্মরক্ষা করার জন্য কৃষ্ণকে সাহায্য করতেই হবে— 'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি

ভারত/ অভুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্। পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং/ ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে'— (৪। ৭-৮)। অর্থাৎ যখন ধর্মের গ্লানি হয়, তখন সাধুদের রক্ষা করা, দুষ্টদিগের বিনাশ ও ধর্মস্থাপনের জন্য আমি অবতীর্ণ হই যুগে যুগে--- (অনু : স্বামী জগদীশ্বরানন্দ--- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, পৃ. ৪)। অর্জুনকে এই কাজে তাঁকে সহায়তা করতেই হবে। তাঁর সব কথা শুনে ও বিশ্বরূপ দেখে অর্জুন সব কিছু বুঝেছেন। সব শেষে তিনি বলেছেন— তাঁর মোহ কেটে গেছে, তিনি স্থিতধী হয়েছেন— 'করিষ্যে বচনম্ তব'— আমি আপনার কথা শুনেই কাজ করব। এবার তিনি তুলে নিয়েছেন গাণ্ডীব— শুরু হয়েছে শত্রু-নিধন— অর্থাৎ ধর্ম-রক্ষার মহান ব্রত।

সুতরাং বলা যায়— 'ধর্ম হলো জীবনের ভিত্তি— এটাই শুভ্র সুন্দরের প্রতীক। এই কারণে বিচারককে বলি 'ধর্মাবতার।' বলি— 'পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম।' কথার কথায় বলি— 'ধর্মত বল্‌ছি', 'তুমি আমার জন্য কী করবে— সেটা তোমার ধর্ম, 'নিচের দিকে যাওয়াটা জলের ধর্ম' 'রাজার ধর্ম হলো প্রজাপালন'। স্বামীজী বলেছেন— 'কোনো কিছুর জন্য ধর্মকে ত্যাগ করা যায় না।'

ধর্মই যদি জীবনবেদ হয়, তাহলে জীবনের সব মুহূর্তেই সেটা জড়িয়ে থাকবে— রাজনীতি সেক্ষেত্রে নীতি-বর্জিত, আদর্শহীন, আভিজাত্য বর্জিত সঙ্কীর্ণতা হবে কেন? তারও ভিত্তি হবে ধর্ম।

আসলে, আমাদের অনেকেই 'ধর্ম' শব্দকে প্রকৃত অর্থে ব্যবহার না করে তার দ্বারা ধর্মীয় আবেগকে প্রাধান্য দিয়েছেন, নেতারা তার মাধ্যমে দলীয় স্বার্থ সিদ্ধ করতে চেয়েছেন। ক্রমেই ধর্মকে কেন্দ্র করে এসেছে সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ও বিদ্বেষের রাজনীতি।

১৮৮৫ সালে যখন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন থেকে তার ভিত্তি ছিল জাতীয়তাবোধ ও ঐক্য-চেতনা। এতে ছিলেন 'all sections and classes of the society'— (ড. আর. জি. আগরওয়াল--- কন্‌স্টিটিউশন ডেভেলপমেন্ট, পৃ. ৯৮)। কিন্তু শিক্ষাবিদ সৈয়দ আমেদ, কবি মহম্মদ ইক্‌বাল প্রমুখ তাকে হিন্দু সংগঠন হিসেবে ধরে নিয়ে বিষোদ্গার শুরু করেছেন। ইক্‌বাল চেয়েছেন মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র। আর ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন, সৈয়দ আমেদ কংগ্রেস ক্ষমতা দখল করলে সংখ্যালঘুদের সর্বনাশ হবে— তাঁরা হবেন দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক— 'the chief object of his life was to instil in the Muslims a spirit of hoshtility for the Hindus and to mould them into a separate nation— (হিস্ট্রি অফ মডার্ন বেঙ্গল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২)। সেই ধারা অনুসরণ করেই ১৯০৬ সালে গঠিত হয়েছে 'মুসলিম লীগ'— এই সংস্থা 'demanded special safeguards and separate electorate'। তার কাজ হয়ে উঠেছে প্রতি ক্ষেত্রেই কংগ্রেস বিরোধিতা— (চন্দ্র, ত্রিপাঠী-দে— ফ্রিডম স্ট্রাগল্, পৃ. ১১৯)। এভাবেই স্থূলার্থে ধর্ম আমাদের রাজনীতিকে বিষাক্ত করে তুলেছে।

গান্ধীজী এক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম শুরু করার জন্য ১৯২১ সালে খিলাফতকে কংগ্রেস আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। সেই সময় কেরলের মালাবারে মোপ্‌লারা ব্যাপকভাবে হিন্দু নিধন করেছে, লুণ্ঠন ও ধর্ষণ চলেছে। কিন্তু ঐক্যের স্বার্থে গান্ধীজী তার নিন্দা করতে পারেননি, বরং মোপলাদের বীরত্বের প্রশংসা করেছেন— (ড. নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য— ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, পৃ. ১৬৫)। এটা চলেছে পরবর্তীকালেও, কারণ এইসব নেতা শুধু খুঁজেছেন সমঝোতা ও ঐক্যের পথ।

১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট থেকে কয়েকদিন ধরে কলকাতায় 'grerat calcutta killing' হলো। লিগ-সরকারের মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দির উদ্যোগে ঘটল 'terrible blood-bath, murders, mob-attacks, arson and pillage'— (ড.) নিমাইসাধন বসু— দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট, পৃ. ১৩৫)। পরে সুরাবর্দি গান্ধীজীর আশ্রয় নিলে তিনি বলেছেন সুরাবর্দি ভাল হয়ে গেছে।

সর্দার প্যাটেল ছিলেন গান্ধীভক্ত— 'a blind follower of Gandhiji'— (সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, পৃ. ৭৫)। কিন্তু প্যাটেল যখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তখন দুবার তাঁর সঙ্গে গান্ধীজীর মতবিরোধ ঘটেছে। তখন সারা ভারতে রক্তপাত ঘটেছে— কিন্তু দিল্লিতে মুসলমানদের নিরাপত্তার দাবিতে গান্ধীজী অনশন করেছেন এবং পাকিস্তানকে ৫৫ কোটি টাকা দেবার জন্য প্যাটেলকে চাপ দিয়েছেন— (পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়— আমাদের সর্দার প্যাটেল, পৃ. ১৩৫)।

নেহরু উঠেছেন আরও ওপরে। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ বারাণসী ও সোমনাথের মন্দিরে গিয়েছেন তাতে নেহরুর তীব্র আপত্তি ছিল— (সম্পাদকীয়, 'দ্য মডার্ন রিভিউ', নভেম্বর, ১৯৭৮)। তাহলে পদস্থ ব্যক্তিকে ধর্মত্যাগ করতে হবে— এটাই প্রগতিশীলতা? তিনি 'হিন্দু কোড্ বিল' পাশ করিয়েছেন। কিন্তু সংবিধানের ৪৪ নং অনুচ্ছেদে সারা দেশে এক ও অভিন্ন দেওয়ানি আইন প্রবর্তনের কথা বলা হয়েছে— তাহলে শরিয়তি আইন রয়ে গেল কেন? রাজীব গান্ধীর আমলে সেটা রক্ষা করার জন্য সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে কীজন্য? ভি.পি. সিংহ জামা মসজিদের ইমামের সঙ্গে হাত মেলালেন কেন? গোধরার ব্যাপারে কেন্দ্র শাহ্ কমিশন বসানোর পরেও লালুপ্রসাদ অন্য একটা কমিশন করিয়ে কেন দেখাতে চাইলেন করসেবকদের হত্যা করা হয়নি? ১৯৫৭ সালে বিধানচন্দ্র রায় অল্প ভোটে জেতার পর বাম-নেতা জ্যোতিবাবু কেন বলেছিলেন— মুখ্যমন্ত্রী মুসলমান ভোট পাননি বলে তাঁদের ওপর যেন অত্যাচার না করেন— তারা এই দেশে তো মরেই আছেন। কলকাতা হাইকোর্টের শতাধিক আইনজ্ঞ লিখেছিলেন— তিনি যেন পাকিস্তানে গিয়ে রাজনীতি করেন। মনমোহন সিংহ হঠাৎ কেন বলে ফেলেছিলেন, এই দেশের সম্পদের ওপর প্রথম অধিকার মুসলমানদের। বুদ্ধবাবু কেন বলেছিলেন অনেক মাদ্রাসা ঠিক পথে চলছে না, তবে দেশে এই রাজ্যই তাদের জন্য বেশি খরচ করে? সহদেব গুপ্ত ঠিকই লিখেছেন— আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো এই সঙ্কীর্ণ ধর্মীয় আবেগের ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে— (দ্য ইন্ডিয়ান কন্‌স্টিটিউশান, পৃ. ২২২)।

ক্ষুদ্রতার এই রাজনীতি কবে শেষ হবে?

(লেখক প্রাক্তন রিডার, নিউ আলিপুর কলেজ)

ইসলামি সন্ত্রাসের কাউন্ট ডাউন শুরু

প্রণয় রায়

'বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ।' —ঠিক এই শব্দবন্ধনীতেই 'নরেন্দ্র মোদী- ডোনাল্ড ট্রাম্প' সাক্ষাৎ ধরা পড়েছে আন্তর্জাতিক মিডিয়ার কাছে। জুন ২০১৭, শেষ সপ্তাহ, বিশ্ব মেতে থাকল ভারতবর্ষকে নিয়েই। বিশ্বের বড় বড় সংবাদপত্রে প্রথম পৃষ্ঠার লিড খবর ভারতবর্ষ। এ ভারতবর্ষ পাশ্চাত্যের ছেঁড়াজামা পরা ভারতবর্ষ নয়, এ ভারতবর্ষ কৃষক-শ্রমিকের ঘাম ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর মাথা উঁচু করা ভারতবর্ষ। এ ভারতবর্ষ সাহায্য চায় না, এ ভারতবর্ষ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়।

জুনের শেষ সপ্তাহের প্রথমার্ধ জুড়ে বিশ্ব মেতেছিল ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর তিন দেশীয় বিদেশ যাত্রা নিয়ে, যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মোদী-ট্রাম্প সাক্ষাৎ। মোদী তাঁর সফর শুরু করেন পর্তুগাল থেকে এবং আমেরিকা হয়ে নেদারল্যান্ড সফর দিয়ে যাত্রা শেষ করেন। স্বাধীনতার পর পর্তুগাল সফরকারী দ্বিতীয় ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পর্তুগিজ প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টিনিও কোসটা আবার ওভারসিজ সিটিজেন অব ইন্ডিয়া। অর্থাৎ তার পূর্বপুরুষ ভারতীয় বংশোদ্ভূত। ফলে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর অভ্যর্থনাও হয় সমস্ত প্রোটকল ভেঙে। সেই দেশের সঙ্গে ভারতের বেশ কিছু সহযোগিতার সন্ধি হয়। পর্তুগাল এমনিতে বিশ্বরাজনীতির কোনো হোমরা-চোমরা না হলেও বর্তমানে ব্রিটেন ছাড়া ইউরোপিয় ইউনিয়নে যথেষ্ট প্রভাবশালী এবং প্রধানমন্ত্রীর ভারতকে বিশ্বের কারখানা বানানোর বড় সহযোগী হয়ে ওঠার মতো ক্ষমতাসম্পন্ন দেশ বলে বিশেষজ্ঞদের মত। কিছু ইউরোপিয় বিশেষজ্ঞের মত হলো, মোদীর এই সফর ভারতীয় মহাকাশ এজেন্সির জন্য খরিদ্দার ধরার সফর। এক্ষেত্রে মোদী অনেকটাই সফল।

প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফরের দ্বিতীয় গন্তব্য ছিল সবচেয়ে বেশি আলোচিত অর্থাৎ তাঁর আমেরিকা সফর। হোয়াইট হাউসের



নরেন্দ্র মোদী ও ডোনাল্ড ট্রাম্প।

বাসিন্দা হওয়ার পর কোনো বিদেশি রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে এটাই ছিল রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের প্রথম বৈঠক। ফলে ট্রাম্পের আগামী বিদেশনীতি বা অমেরিকার আগামীদিনের নীতি কোনদিকে দৌড়াবে তা জানার অধীর আগ্রহ ছিল বিশ্ববাসীর মনে। অবশ্য প্রেক্ষাপট তৈরিই ছিল নির্বাচনের আগে। ট্রাম্প হিন্দু ধর্মাবলম্বী ও ভারতীয়দের পক্ষে বার বার মুখ খুলেছিলেন। রাষ্ট্রপতি পদের শপথ নেওয়ার ঠিক পর পরই তিনি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন। তাতে ভারতকে আমেরিকার অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে উল্লেখ করেন। ফলে এই সফর দু' দেশের কাছেই ছিল প্রত্যাশার সফর।

এবারের ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর আমেরিকা সফর কূটনীতির আঙ্গিনায় ছকভাঙা সফর হিসেবে উল্লেখ থাকবে। যেভাবে দুই রাষ্ট্রনেতা বার বার সহযোগিতার কথা বলেন তা ঠাণ্ডা-যুদ্ধ পরবর্তী জমানায় বিশ্ব রাজনীতিতে বিরল। ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বের স্বার্থে আমেরিকার দীর্ঘ ৭০ বছরের বিদেশনীতির সবচেয়ে বড় তুরুপের তাস পাকিস্তানকেও বাতিলের খাতায় ফেলে দেওয়া। রক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এটাই আমেরিকার বিদেশনীতির সবচেয়ে বড় পরিবর্তন। যেভাবে দুই নেতা সারা বিশ্ব থেকে ইসলামি সন্ত্রাসবাদ ও চরমপন্থাকে শেষ করার শপথ নিয়েছেন তাতে আগামীদিনের দেওয়াল লিখন স্পষ্ট করে দিয়েছে। চেলা পাকিস্তানকে সঙ্গী করে গুরু ড্রাগনের চোখও ছানাবড়া। পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমের মতে সেদেশের নেতৃত্ব নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে টক্কর দেওয়ার অযোগ্য। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেভাবে আমেরিকার মঞ্চকে ব্যবহার করে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক-এর গুণগান গাইলেন তাতে আরও এধরনের গোপন ও প্রকাশ্য অভিযানের রাস্তা খুলে গেল। সেক্ষেত্রে লাদেন খতম অভিযানের মতো আরও অভিযান হবে বলে পাকিস্তানি মিডিয়ার আশঙ্কা।

সেই সঙ্গে আমেরিকা থেকে আধুনিক অস্ত্র পাওয়া বন্ধ হয়ে গেলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই তাদের ভাঁড়ার শূন্য হয়ে



নরেন্দ্র মোদী ও নেতানিয়াহু।

পড়বে। কারণ আমেরিকার অস্ত্রে বলীয়ান পাকিস্তানকে তার রসদও আমেরিকাই জোগাতে পারে। আমেরিকা থেকে রসদ ও কলকবজা বন্ধ হয়ে গেলে এমনিতেই 'হাজার বছর জেহাদে সক্ষম' পাকিস্তানের অস্ত্রশস্ত্রগুলি ভাঙাচোরা দামে বিকোতে হবে।

অন্যদিকে, আগ্রাসী চীন তো প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠেছে। তারা ভারত- আমেরিকার জোট কতটা শক্তিশালী তার আন্দাজ করতে অক্ষম। ফলে তারও লাফালাফি চরমে। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফর কালে সীমান্তে সমস্যা তৈরি চীনের গোপন ভয়কেই সামনে এনেছে। চীন জানে বর্তমান বিশ্বে পারস্পরিক যুদ্ধ অচল। ফলে আগামী যুদ্ধ হবে বাণিজ্যিক যুদ্ধ। যে যুদ্ধে চীন ভারত থেকে অনেক কদম এগিয়ে গেলেও যেভাবে নরেন্দ্র মোদী 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র প্রচারে নেমেছে তাতে চীন ভয় পেয়েছে। তরুণ ভারতবর্ষ (৭০ ভাগ জনসংখ্যা ৪০ বছরের নীচে), সম্পদশালী ও প্রযুক্তিসমৃদ্ধ জাপান ও আমেরিকা যদি একজোট হয় তবে চীনা প্রাচীর ভেঙে যাওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা।

এই সফরের সবচেয়ে বড় পাওনা গুড টেররিজম্ ও ব্যাড টেররিজমের ধারণার মৃত্যু। দুই নেতা যেভাবে বিশ্ব থেকে ইসলামি সন্ত্রাসবাদকে শেষ করার শপথ নিয়েছেন তাও এক কথায় নতুন প্রভাতের অঙ্গীকার। সরাসরি পাকিস্তানকে 'সন্ত্রাসবাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল' বলে আক্রমণ হেনেছে আমেরিকা। ভারতের দাবি মেনে পাকিস্তানের সরকারি মেহমান সৈয়দ সালাউদ্দিনকে 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী' ঘোষণাও করেছে আমেরিকা। মোদীর প্যাঁচে সন্ত্রাসবাদীদের দম যে কতটা আটকেছে তার উদাহরণ দুই রাষ্ট্রপ্রধানের কথা চলাকালীনই আলকায়দার সরাসরি ভারতে হামলার ঘোষণা। তাদের নিশানায় ভারতীয় সেনা ও হিন্দু সংগঠনগুলির নেতারা রয়েছেন বলেও তারা জানিয়েছে। অন্যদিকে, ইসলামি স্টেটও ভারতকে শত্রু ঘোষণা করেছে অনেক আগেই। ফলে ইসলামি সন্ত্রাসবাদের ঘোষিত শত্রুর দলে এখন ভারতও। আর এই জন্যই মোদী হোয়াটওয়াশ লড়াইয়ের ডঙ্কা বাজিয়ে দিয়েছেন বলে রক্ষা বিশেষজ্ঞদের মত। এবারের সফরের আর একটা বড় পাওনা রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের স্থায়ী সদস্যপদের দাবিকে ট্রাম্পের সরাসরি সমর্থন। অর্থাৎ চীন ছাড়া অন্য চারটি ভেটোপ্রাপ্ত দেশই ভারতকে নিঃশর্ত সমর্থন করেছে। সেই সঙ্গে 'বিপজ্জনক' নন এমন ভারতীয়দের আমেরিকায় প্রবেশেও বেশ কিছু ছাড় দেওয়া হলো। এই ধরনের সুবিধা আমেরিকা ইউরোপের কিছু দেশকে দিলেও ভারতের ক্ষেত্রে বিরাট পাওনা। ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শান্তি বজায় রাখার পক্ষে সওয়াল করে চীনা জঙ্গি আস্ফালনের বিরুদ্ধেই আমেরিকা মুখ খুলল বলে চীনা মিডিয়ার দাবি। হোয়াইট হাউসে ঢোকার মুখেই ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে সস্ত্রীক ট্রাম্প উষ্ণ অভ্যর্থনার যে সুর বেঁধে দিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর সফর শেষও হলো দু' নেতার এই সফরে তৃতীয় বার আলিঙ্গনের মাধ্যমে। কূটনীতিকদের একাংশ বলছেন, আমেরিকা সফরের মাধ্যমে মোদী ইসলামি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যে মহাজোট গড়ার কাজ শুরু করেছেন তা পূর্ণ হলো মোদীর ইজরায়েল সফরের মধ্য দিয়ে। সেখানকার মিডিয়া লিখছে, 'বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রধানমন্ত্রী স্বাগত'। পুনশ্চ: জুন মাসের শেষ সপ্তাহের শেষ অংশের আলোচ্য বিষয় নেদারল্যান্ডের রাষ্ট্রনেতার হিন্দি টুইট এবং ভারতের সবচেয়ে বড় পরোক্ষ কর সংস্কার। দীর্ঘ সময় পর ভারতে জিএসটি চালু। ■

মোদী ট্রাম্পের যুগলবন্দি

নতুন সামরিক জোটের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন ড্রাগন



নরেন্দ্র মোদী ও ডোনাল্ড ট্রাম্প যৌথ বিবৃতি দিচ্ছেন।

সন্দীপ চক্রবর্তী

ড্রাগন মানে চীন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমেরিকা সফর এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর বহুচর্চিত বৈঠকের পর দুই নেতার গলায় ভূ-রাজনৈতিক নানা বিষয়ে যে সুর শোনা গেছে তাতে চীন উদ্বিগ্ন। উদ্বেগের প্রকাশ অবশ্য ঘটেছে ঔদ্ধত্যে। সেটাই স্বাভাবিক। কারণ গত কয়েক বছর ধরেই চীন ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে দাদাগিরিতে অভ্যস্থ। এতবড়ো চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়িয়ে কূটনৈতিক দৌত্যের কথা পাড়লে চীনের মান থাকত না।

বৈঠকের ঠিক পরেই চীনের একটি সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্রে একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে লেখা হয়, তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয় ভারত-আমেরিকার এরকম কোনো জোটকে চীন মেনে নেবে না। চীনের স্বার্থবিরোধী কোনো পদক্ষেপ করা হলে তার পরিণাম হবে ভয়ঙ্কর। ভারত এবং চীনের মধ্যে যুদ্ধ হওয়াও অসম্ভব নয়। সংবাদপত্রটি (গ্লোবাল টাইমস) লিখেছে, 'Washington and New Delhi share anxieties about China's rise. In recent years, to ratchet up geopolitical pressure on China, the US has cozied up to India.'

সরকারি সংবাদপত্রের হুমকি আর সরকারের মনোভাবে যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল সিকিম সীমান্তে চীনের মাত্রাতিরিক্ত সেনা মোতায়েনের ঘটনায় এবং ভারতের দুটি বাঙ্কার বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেবার মধ্যে। চীনের অভিযোগ, ভারত নাকি চীনের সীমানায় ঢুকে বাঙ্কার দুটি তৈরি করেছিল। প্রশ্ন হলো, ২০১২ সালে তৈরি বাঙ্কার দুটি যে অবৈধ সেটা বুঝতে চীনের পাঁচ বছর সময় লাগল?

যদিও চীনের ঔদ্ধত্যের জবাব ভারত দিয়েছে পাল্টা সেনা মোতায়েন করে। ১৯৬২ সালের যুদ্ধে ভারতের পরাজয়কে ব্যঙ্গ করে চীন যে খোঁচা দিয়েছিল, প্রতিরক্ষামন্ত্রী অরুণ জেটলি তার জবাবে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, ৬২-র ভারত আর ২০১৭-র ভারত এক নয়। আপাতত ভারতীয় বাহিনী এবং চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মি বন্দুক নামিয়ে অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকায়। কিন্তু মিলিটারি পরিভাষায় এই 'স্ট্যান্ড অফ' কতদিন স্থায়ী হবে তা বলা মুশকিল। কারণ ভারতীয় নৌবাহিনীর উপগ্রহ রুক্মিণী (জিস্যাট ৭) থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী চীন ভারত মহাসাগরে ডুবোজাহাজ এবং যুদ্ধজাহাজের সংখ্যা ক্রমশ বাড়িয়ে চলেছে। এসব যুদ্ধজাহাজের মধ্যে যেমন রয়েছে লুইয়াং-৩ শ্রেণীভুক্ত গাইডেড মিসাইল ডেস্ট্রয়ার ঠিক তেমনই রয়েছে ভয়ঙ্কর বিধ্বংসী ক্ষমতাসম্পন্ন হাইড্রোগ্রাফিক রিসার্চ ভেসেল। নৌবাহিনীর উপগ্রহ, উপকূলরক্ষী বাহিনীর বিমান এবং টহলরত ভারতীয় যুদ্ধজাহাজ সূত্রে জানা গেছে ভারত মহাসাগরে এই মুহূর্তে চীনের ১৩টি যুদ্ধজাহাজ নজরদারি চালাচ্ছে।

অবশ্যই চীনের এই বিপুল কর্মকাণ্ডের সবটাই নরেন্দ্র মোদী এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের বৈঠকের পর শুরু হয়নি। গত দু' মাস ধরে এই আগ্রাসন চলছে। তবে একথা অনস্বীকার্য, বৈঠকের পর এর মাত্র অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈঠকে ডোনাল্ড ট্রাম্প চীনের ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড প্রকল্প নিয়ে ভারতের উদ্বেগ সমর্থন করেছেন। স্বীকার করেছেন এর ফলে ভারতের সার্বভৌমত্ব আক্রান্ত হতে পারে। সৃষ্টি হতে পারে ঋণের ফাঁদ এবং বাড়তে পারে পরিবেশ দূষণের মাত্রা। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে ভারতকে অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং সামরিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী করে তোলার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ট্রাম্প। এছাড়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় ভারতের অংশগ্রহণ যাতে সুনিশ্চিত করা যায় সে বিষয়েও সাহায্য করবে আমেরিকা।

চীনের অন্য একটি প্রকল্প চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর নিয়ে ভারতের উদ্বেগেও সায় দিয়েছে আমেরিকা। উল্লেখ্য, চীনের ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড অর্থনৈতিক করিডোর প্রকল্পের অঙ্গ। ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড প্রকল্পের বৈঠকে অনুপস্থিত থেকে ভারত তার প্রতিবাদ ব্যক্ত করেছে। মোদী ও ট্রাম্পের যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে,



বঙ্গোপসাগরে ভারত-জাপান-আমেরিকার যৌথ মহড়া।

'পরিকাঠামোর সুষ্ঠু উন্নয়নের মাধ্যমে আঞ্চলিক স্তরে অর্থনৈতিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় পরিবর্তন অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু তা কখনোই একটি দেশের সার্বভৌমত্ব এবং ভূ-রাজনৈতিক নিরাপত্তার বিনিময়ে নয়।' দুই রাষ্ট্রপ্রধান সংশ্লিষ্ট প্রতিটি দেশকে এই নিয়ম মেনে চলার আহ্বান জানান। প্রসঙ্গত উঠে আসে উত্তর কোরিয়া এবং সে দেশের যুদ্ধোন্মাদ প্রেসিডেন্ট কিমের কথা। যৌথ বিবৃতিতে আমেরিকার তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়, উত্তর কোরিয়াকে সংযত করার কোনো চেষ্টাই চীন করছে না। ভারত, সম্ভবত এই প্রথম, কঠিনতম ভাষায় উত্তর কোরিয়ার কাজকর্মকে 'প্ররোচনামূলক' এবং 'বিশ্বশান্তির প্রতিবন্ধক ও ভূ-রাজনৈতিক স্থিতাবস্থার পক্ষে বিপজ্জনক' বলে সমালোচনা করে। ভারত মহাসাগর এবং এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে ভারতের ভূমিকার প্রশংসা করেছে আমেরিকা। যৌথ বিবৃতিতে বেশ কয়েকবার উঠে এসেছে এই প্রসঙ্গ। আফগানিস্তানে ভারতের ভূমিকাও প্রশংসিত হয়েছে।

চীনের মাথাব্যথার কারণ ভারত ও আমেরিকার এই এক সঙ্গে চলার বার্তা। এই বার্তা যে নেহাতই কথার কথা নয় তার প্রমাণস্বরূপ ভারত, আমেরিকা এবং জাপান ৭ জুলাই থেকে বঙ্গোপসাগরে ত্রিপাক্ষিক নৌ মহড়া দিতে চলেছে। এর পোশাকি নাম 'মালাবার ২০১৭'। ওয়াকিবহাল মহলের অভিমত, ভারত মহাসাগরে ডুবোজাহাজের সংখ্যা বাড়িয়ে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তাকে চ্যালেঞ্জ করেছে চীন। তাই আমেরিকা এবং জাপানের সঙ্গে মহড়ার মাধ্যমে ভারত চীনকে কড়া বার্তা পাঠাতে চাইছে। দিল্লির মার্কিন দূতাবাস থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, মালাবার মহড়ায় আমেরিকার বিমানবাহী রণতরী 'ইউ এস এস নিমিৎজ', 'ইউ এস এস প্রিন্সটন', ডেস্ট্রয়ার গোত্রের 'ইউ এস এস শ্যুপ' এবং 'ইউ এস এস কিড' অংশগ্রহণ করবে। নৌসেনা সূত্রের খবর, ভারতের সব থেকে বড় মাপের বিমানবাহী যুদ্ধজাহাজ 'আই এন এস বিক্রমাদিত্য'-সহ একাধিক যুদ্ধজাহাজ ও বিমানকে মহড়ায় নামানো হবে। জাপান থেকেও আসছে একাধিক যুদ্ধজাহাজ। প্রথম তিনদিন যুদ্ধের পরিকল্পনা এবং অন্যান্য মহড়া চলবে। ১০ জুলাই জলে নামবেন নৌসেনারা। যুদ্ধ বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারত মহাসাগরে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে একাধিক দেশ মিলে কীভাবে অভিযান চালানো হবে তার অনুশীলন এই ধরনের মহড়ার অন্যতম উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গে এই তিনটি দেশের কোনো একটির বিরুদ্ধে একাধিক দেশ সামরিক অভিযান শুরু করলে কীভাবে সমন্বয় বজায় রাখা হবে তার পথনির্দেশ খোঁজাও এই মহড়ার উদ্দেশ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হিমাচল প্রদেশে তাইল্যান্ডের সঙ্গেও যৌথ মহড়া চালাচ্ছে ভারত। সেখানেও জোর দেওয়া হয়েছে পারস্পরিক সমন্বয় রক্ষার ওপর। অর্থাৎ শুধু আমেরিকা বা জাপান নয়, তাইল্যান্ড, ভুটান, ভিয়েতনামের মতো ছোট ছোট দেশগুলিও এগিয়ে আসছে ভারতের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। এরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো কারণে চীনের ওপর ক্ষুব্ধ। তাই ভারতের সঙ্গে জোট বাঁধতে চায়। চীন সিঁদুরে মেঘ দেখছে এইখানে। চীন ভালোই জানে এতগুলি দেশের সম্মিলিত সামরিক শক্তির সঙ্গে পাল্লা দেবার ক্ষমতা তার নেই।

পাকিস্তান যদি সারা বিশ্বের কাছে ঘৃণা এবং উপহাসের পাত্র হয়ে ওঠে তাহলে চীনের প্রকল্প দুটি চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়বে। মাঠে মারা যাবে এত বড়ো বিনিয়োগ। যে লোকসান হবে তার ধাক্কা সামলানো চীনের মতো বিত্তশালী দেশের পক্ষেও কঠিন হবে।

মোদী-ট্রাম্পের বৈঠকে আলোচিত আরও একটি বিষয় চীনকে চরম বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে। সেটা হলো চীনের দোসর পাকিস্তানকে সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর হিসেবে মান্যতা প্রদান এবং হিজবুল মুজাহিদিন নেতা সৈয়দ সালাউদ্দিনকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী হিসেবে ঘোষণা। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দু' দেশের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করার প্রতিশ্রুতি-সহ এই প্রথম যৌথ বিবৃতিতে সীমান্ত সন্ত্রাসের প্রসঙ্গটি স্থান পেয়েছে।

এর আগে সীমান্ত সন্ত্রাসে পাকিস্তানের ভূমিকার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল হোয়াইট হাউসের একটি বিবৃতিতে, যখন সুসান রাইস জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের অজিত দোভালের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার সময় ১৮ সেপ্টেম্বর উরির সেনাছাউনিতে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের তীব্র নিন্দা করেছিলেন। তবে সেটা ছিল অনেকটাই কূটনৈতিক বিবৃতি। সৈয়দ সালাউদ্দিনকে বিশেষভাবে বিপজ্জনক আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে দুই রাষ্ট্রপ্রধান অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক স্তরে সন্ত্রাসবাদী নেতাদের চিহ্নিত করার কাজে গুরুত্ব দেবার ব্যাপারে সম্মত হয়েছেন। দুই নেতা যৌথ বিবৃতিতে বলেছেন, 'অন্য দেশে সন্ত্রাসবাদী হামলা করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের কখনোই সন্ত্রাসবাদীদের সে দেশের জমি ব্যবহার করতে



ওয়ান বেল্ট, ওয়ান রোড-এর মানচিত্র।

দেওয়া উচিত নয়। পাকিস্তানের উচিত ২৬/১১-র মুম্বই, উরি-পাঠানকোট এবং অন্যান্য সীমান্ত সন্ত্রাসে যারা অভিযুক্ত অবিলম্বে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া।' এই বিবৃতি থেকে পরিষ্কার পাকিস্তানকে স্পষ্টতই সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর হিসেবে দেখছে আমেরিকা।

এখন প্রশ্ন হলো, এতে চীনের কী ক্ষতি? এক কথায় এর উত্তর, বিরাট ক্ষতি। এই মুহূর্তে পাকিস্তান হলো চীনের ল্যাবরেটরি। চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর প্রকল্পে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছে চীন। এর সঙ্গে রয়েছে ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড উদ্যোগ। যার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে পূর্বতন প্রকল্পটি। এই অবস্থায় পাকিস্তান যদি সারা বিশ্বের কাছে ঘৃণা এবং উপহাসের পাত্র হয়ে ওঠে তাহলে প্রকল্প দুটি চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়বে। মাঠে মারা যাবে এত বড়ো বিনিয়োগ। যে লোকসান হবে তার ধাক্কা সামলানো চীনের মতো বিত্তশালী দেশের পক্ষেও কঠিন হবে।

না, চীনের মাথাব্যথার কারণ অবশ্যই শুধুমাত্র অর্থনৈতিক নয়। আরও একটি গোপন তাস চীনের আস্তিনে লুকনো রয়েছে। শক্তি বাড়লেই শক্তি প্রদর্শনের ইচ্ছে জেগে ওঠে। এ ব্যাপারে সমাজতান্ত্রিক এবং ধনতান্ত্রিক দেশের মধ্যে বিশেষ কোনো ফারাক নেই। তাছাড়া, লাল রঙটুকু বাদ দিলে চীনে সমাজতন্ত্রের বিশেষ কিছু আর পড়ে নেই। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নায়ক মাও জে দঙের মূর্তিগুলোও কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে। চীন এখন ধনতন্ত্রের পীঠস্থান। সেই সুবাদে শক্তি বাড়ার সঙ্গে বেড়েছে তার দক্ষিণ এশিয়ার প্রভু হয়ে ওঠার লোভ। অন্য দেশ ভাঙার, তাকে দখল করার বাসনা। এই বাসনারই প্রকাশ দেখা যায় তাইওয়ানকে দখল করে রাখার মধ্যে, অরুণাচল প্রদেশকে নিজের বলে দাবি করার মধ্যে কিংবা সাম্প্রতিককালে সিকিমের অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলার মধ্যে।

ভারতের দিক থেকে দেখলে এই বৈঠক শুধু সফল নয়, যুগান্তকারীও বটে। কারণ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ভারতের এতদিনের লড়াই মর্যাদা পেল। চীনকেও বুঝিয়ে দেওয়া গেল ভারত একা নয়। তার পাশে সারা বিশ্ব রয়েছে।

কিছুদিন আগে চীন থেকে ভারতের একটি মানচিত্র প্রকাশিত হয়েছিল যেখানে অরুণাচলের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। চীনের এই মানসিকতা থেকে জন্ম হয়েছে চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর বা ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড প্রকল্পের। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, এই করিডোর বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে তৈরি করার কথা মুখে বললেও আড়ালে রয়েছে সামরিক উদ্দেশ্য। সেটা বুঝেই ভারত এর প্রতিবাদ করেছে।

এই করিডোর তৈরি হলে দিল্লি-সহ সমগ্র উত্তর ভারত চীনের র‍্যাডারে চলে আসবে। পাক-অধিকৃত কাশ্মীর পেরিয়ে চীনা সৈন্য সহজেই জম্মু-কাশ্মীরে ঢুকে পড়বে। চীনের আগ্রাসী মনোভাবের এখনও পর্যন্ত সর্বশেষ প্রমাণ সিকিম সীমান্তে তাদের সৈন্য মোতায়েন। তাদের অভিযোগ, ভারত নাকি তাদের সীমানায় ঢুকে রাস্তা আর বাঙ্কার বানিয়েছে। এর থেকে হাস্যকর অভিযোগ আর কিছু হয়?

সুতরাং নরেন্দ্র মোদী এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের বৈঠক এবং দু'দেশের যৌথ বিবৃতিতে চীনা ড্রাগন যে জেগে উঠবে সেটাই স্বাভাবিক। তবে ভারতের দিক থেকে দেখলে এই বৈঠক শুধু সফল নয়, যুগান্তকারীও বটে। কারণ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ভারতের এতদিনের লড়াই মর্যাদা পেল। চীনকেও বুঝিয়ে দেওয়া গেল ভারত একা নয়। তার পাশে সারা বিশ্ব রয়েছে। দাদাগিরি করলে তার ফল ভালো হবে না।

এই সময়

হঠাৎ বিপদ

বিপদ কখনও বলে আসে না। এক ব্যক্তি ইংল্যান্ডের উরসেস্টার ক্যাথিড্রালের ৩০০



ফুট উচ্চতার ঘণ্টামিনারের ছাদ থেকে ছবি তুলছিলেন। হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। খবর দেওয়া হয় কোস্টগার্ডকে। তাদের হেলিকপ্টার এসে উদ্ধার করে তাকে।

নর-বানর

জন্তুজানোয়ারদের ছোটবেলার ভিডিও দেখতে অনেকেই ভালোবাসেন। পশুরাও



এর ব্যতিক্রম নয়। সম্প্রতি কেন্টুকির লুইসভিলে চিড়িয়াখানায় একটি গোরিলাকে একেবারে মগ্ন হয়ে গোরিলাদেরই ছোটবেলার ভিডিও দেখতে দেখা গেছে। সঙ্গী এক মহিলা। নর-বানরের এমন সহাবস্থান চট করে দেখা যায় না।

রক্ষক

ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়। পাঁচটা ভয়ানক বিষাক্ত সাপ কুড়ি ফুট গভীর কুয়োয় আটকে



পড়েছিল। অস্ট্রেলিয়ার পার্থের বাসিন্দা রস ম্যাকগিবন উদ্ধার করেছেন তাদের। পেশায় তিনি সরীসৃপদের রক্ষক। বিষাক্ত সাপ ধরার প্রশিক্ষণও রয়েছে।

সমাবেশ -সমাচার

মহাজাতি সদনে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কৃতী বিদ্যার্থী সংবর্ধনা

ভারতের সর্ববৃহৎ ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ গত ৯ জুলাই তাদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে কলকাতা মহানগরের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনার আয়োজন করে মহাজাতি সদনে। অনুষ্ঠানের শুরুতে ষষ্ঠশ্রেণীর ছাত্রী অনুপমা চৌধুরী যোগনৃত্যের মাধ্যমে বিভিন্ন যোগাসন সাবলীল ভঙ্গিতে পরিবেশন করে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবক মণ্ডলীকে মন্ত্রমুগ্ধ করে দেয়। বিকেল ৫টায়



রাজ্যপালের পাশে সুপ্রিয়া হালদার ও রাজ্য সম্পাদক অনুপ সাহা

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী মঞ্চে উপবেশন করেন। তাছাড়া মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সিস্টার নিবেদিতা স্কুলের ভাইস প্রিন্সিলাল প্রব্রাজিকা ভবরূপাপ্রাণা মাতা, প্রাক্তন MASCOM-এর নির্দেশক সুপর্ণ মৈত্র, চেয়ারপারসন বোর্ড অব গভর্নর্স IISER, MOHLI ডাঃ মধুছন্দা কর, বিদ্যার্থী পরিষদের রাজ্য সভাপতি ডাঃ রমণ ত্রিবেদী, বিদ্যার্থী পরিষদের রাজ্য সম্পাদক অনুপ সাহা, কলকাতা শাখার সহ-সভাপতি রম্যজ্যোতি সরকার প্রমুখ। স্বাগত ভাষণে ডাঃ ত্রিবেদী সারা দেশে বিদ্যার্থী পরিষদ ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রী ও জাতীয় স্বার্থে যে সেবাকাজ পরিচালনা করছে তার বিশদ বর্ণনা করেন। ছাত্র আন্দোলনের বিভিন্ন ক্রমিক বর্ণনা করে ছাত্রসমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান অনুপ সাহা। সুপর্ণ মৈত্র ও ডাঃ মধুছন্দা কর সফলতার রহস্য সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনজন ছাত্রী—সুপ্রিয়া হালদার, সাক্ষী মোর ও সৃজনী সেন— যারা অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থায় পড়াশোনা চালিয়ে কৃতী হয়েছে তাদের রাজ্যপাল বিশেষ ভাবে অভিনন্দিত করেন। রাজ্যপাল বিদ্যার্থীদের উদ্দেশে বলেন, 'আজ আমি সভাগৃহ পরিপূর্ণ ছাত্রী-ছাত্রীদের মধ্যে আগামী ভারতকে দর্শন করছি। দেশের সামনে যে প্রতিকূল সমস্যা আসবে তার মোকাবিলা করে ভারতকে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।' এরপর তিনি ভারতের বৈভবময় অতীত থেকে প্রেরণা নিয়ে বর্তমানে আবার দেশ শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করার জন্য এগিয়ে চলেছে— তার প্রাঞ্জল বর্ণনা করেন। ভারতের সাংস্কৃতিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে বিদ্যার্থী পরিষদ ছাত্রসমাজের মধ্যে কাজ করে চলেছে তা ছাত্রছাত্রীদের স্মরণ করিয়ে দেন।

এরপর সুশৃঙ্খল ভাবে কৃতী ছাত্র-ছাত্রীরা মঞ্চে এসে সুপর্ণ মৈত্র, ভবরূপাপ্রাণা মাতার হাত থেকে শংসাপত্র ও আশীর্বাদ গ্রহণ করে। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বিদ্যার্থী পরিষদের কলকাতা মহানগরের আহ্বায়ক ডাঃ অভিষেক হালদার।

এই সময়

অচেনা মুখ



দেখুন তো চিনতে পারেন কি না? পারছেন না তো? ছবিটি এই সময়ের একজন জনপ্রিয় অভিনেত্রীর। তার জীবনের প্রথম অভিনয় মঞ্চে। ছবিটি সেই নাটকের একটি চরিত্রের। অভিনেত্রীর নাম বিদ্যা বালন।

উলটো উড়ান

ছুটির দিনে মজা করবেন বলে রোলার কাস্টারে চড়েছিলেন ওরা। কিন্তু চলতে



চলতে হঠাৎই বন্ধ হয়ে গেল রোলার কাস্টার। প্রায় কুড়ি সেকেন্ড ওরা ঝুলে রইলেন উল্টোদিকে মাথা করে। ভাগ্য ভালো কেউ আহত হননি। ঘটনাটি ইংল্যান্ডের মাইল ওক অঞ্চলের।

সড়কে রেকর্ড

প্রধানমন্ত্রী গ্রামসড়ক যোজনার রূপায়ণে নতুন রেকর্ড গড়ল মোদী সরকার।



২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে এই যোজনায় প্রতিদিন গড়ে ১৩০ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হয়েছে। ২০১১ থেকে ২০১৪ —এই কালপর্বে প্রতিদিন গড়ে ৭৩ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হোত।

সমাবেশ -সমাচার

সহকার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ শাখার রাজ্য অধিবেশন

সর্বভারতীয় সমবায় সংগঠন সহকার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ শাখার প্রথম রাজ্য অধিবেশন আদ্যাপীঠে গত ২৪-২৫ জুন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গের ২২টি জেলা থেকে মোট ৪৫৪ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। পুরুষ প্রতিনিধি ছিলেন ৩২৮ জন ও মহিলা প্রতিনিধি ছিলেন ১২৬ জন। এছাড়া দেশের ও রাজ্যের প্রায় শতাধিক সমবায় ক্ষেত্রের অনুভবী ব্যক্তি ও সমাজসেবক অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয় সহকার ভারতীয় সমবায় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে। পতাকা উত্তোলন করেন সহকার ভারতীর দুগ্ধ প্রকোষ্ঠের প্রমুখ মার্কেন্ডেয় সিংহ। এরপর



রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আনা সমবায় দ্রব্যের প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন সহকার ভারতীর সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি সুশান্ত সরকার। প্রদর্শনীতে মধু, তুলাইপঞ্জী চাল, তাঁতের শাড়ি, বিভিন্ন দেশীয় প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন ধূপ, সাবান ও ভেষজ ওষুধ-সহ সমবায়ে উৎপাদিত বিভিন্ন দ্রব্য প্রদর্শিত হয়। আগত প্রতিনিধিরা সরাসরি সমবায়ী ব্যক্তিদের সঙ্গে অভিমত আদান প্রদান করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আদ্যাপীঠের পূজ্য মহারাজ মুরাল ভাই, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ-প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈত চরণ দত্ত, সহকার ভারতীর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ড. উদয় যোশী, সর্বভারতীয় সংগঠন সম্পাদক বিজয় দেবাঙ্গন-সহ সর্বভারতীয় নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। প্রদীপ প্রজ্বলন ও ভারতমাতার ছবিতে পুষ্প অর্পণ করে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পূজ্য মুরাল ভাই। এরপর রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভুর ভিডিও ভাষণ শোনানো হয় (তিনি বিশেষ কারণে আসতে পারেননি তাই ভিডিও মেসেজ পাঠিয়েছিলেন)। রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর শুভেচ্ছা বার্তা পাঠ করা হয়। উদ্বোধনী ভাষণে অদ্বৈত চরণ দত্ত সমবায় ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা ও সহকার ভারতী পশ্চিমবঙ্গের সম্ভাবনার কথা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেন। এরপর শ্রী দত্ত সহকার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ শাখার পত্রিকা 'সমবায় প্রবাহ'র বিশেষ সংখ্যা স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। বিশিষ্ট রবীন্দ্র গবেষক ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সমবায়ের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা সবিস্তারে বর্ণনা করেন।

সন্ধ্যায় সহকার ভারতীর সংবিধান অনুসারে তিন বছর অন্তরের সাংগঠনিক নির্বাচন

এই সময়

স্বচ্ছ ভারত

২ অক্টোবর কেন্দ্রীয় সরকার মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, কেরল এবং



তেলেঙ্গানার ১১৩৭টি বড়ো ও ছোট শহরকে স্বচ্ছতার সার্টিফিকেট দেবে। এইসব শহরে মলমূত্র ত্যাগ করার জন্য কেউ খোলা জায়গায় যান না।

ভূস্বর্গে চাষ

এ বছর জম্মু-কাশ্মীরে ধান, শাকসবজি এবং ফলের রেকর্ড উৎপাদন হয়েছে। খবরটি দিয়েছেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী রাধামোহন সিংহ। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী



জম্মু-কাশ্মীরের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন। চাষিদের উন্নতির জন্য এ রাজ্যে অনেকগুলো প্রকল্প হাতে নিয়েছে কেন্দ্র।

বৈধ কামবালা

জালিকাট্টুর পর কামবালাও বৈধ হলো কর্ণাটকে। রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় সংশ্লিষ্ট



অর্ডিন্যান্সে সাক্ষর করার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন এই খেলাটি সম্বন্ধে সমস্ত অনিশ্চয়তার অবসান ঘটল। কামবালা হলো মোষের বা মোষের গাড়ির দৌড়। কর্ণাটকে খুবই জনপ্রিয়।

অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনী তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা পালন করেন বিশিষ্ট সমবায়ী ব্যক্তি ও সহকার ভারতীর যুগ্ম সংগঠন সম্পাদক বিষ্ণু বোবড়ে। নির্বাচনে বিজয়কৃষ্ণ তালুকদার পশ্চিমবঙ্গ সহকার ভারতীর সভাপতি হিসেবে ও সঞ্জয় ত্রিপাঠী সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার সদস্য সুনীলপদ গোস্বামী এবং পূর্বক্ষেত্র প্রচারক প্রদীপ যোশী। নবনির্বাচিত সভাপতি বিজয়কৃষ্ণ তালুকদার ৪৩ সদস্যের রাজ্য কার্যকারিণীর ঘোষণা করেন। সমাপ্তি বক্তব্য রাখেন বিজয় দেবাঙ্গন। পশ্চিমবঙ্গ সহকার ভারতীর সংগঠন সম্পাদক বিবেকানন্দ পাত্রের সমাপন মন্ত্র পাঠের মাধ্যমে অধিবেশনের সমাপ্তি হয়।

হাওড়ার তাজপুরে ড. শ্যামাপ্রসাদ জয়ন্তী উদ্‌যাপন

গত ৬ জুলাই শ্যামাপ্রসাদ ইন্সটিটিউট অব কালচার, তাজপুর, হাওড়ার উদ্যোগে সকাল ৮টা থেকে সারাদিন ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অখণ্ড ভারতের অমর পূজারি, ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১১৭ তম জন্মজয়ন্তী পালিত



হয়। শুরুতেই ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ ও লোকপ্রিয় জননেতা প্রসাদ চক্রবর্তীর মর্মর মূর্তিতে মাল্যার্পণ করা হয়। পরে প্রসাদতীর্থ সভাগৃহের জনাকীর্ণ সমাবেশে ড. মুখোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যার্পণের পর তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে মনোগ্রাহী আলোচনা করেন শিবশংকর বেজ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ পৃথ্বীশকুমার সামন্ত, নন্দলাল মণ্ডল, বিজেপির গ্রামীণ জেলা সভাপতি অনুপম মল্লিক প্রমুখ। বর্ষব্যাপী বৃক্ষরোপণের সূচনা স্বরূপ কয়েকটি চারাগাছ রোপণ করা হয়।

১৯৮৫ সাল থেকে সংস্থা দীর্ঘ ৩৩ বছর পরে এই দিনটিকে স্বেচ্ছা রক্তদানের জন্য চিহ্নিত করে ধারবাহিক ভাবে রক্তদান করে চলেছে। এদিনের শিবিরে ১২ জন মহিলা-সহ ৬৩ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। বিকালে প্রসাদস্মৃতি সরস্বতী শিশুমন্দিরের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের সমন্বয়ে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে আবৃত্তি, সঙ্গীত, নৃত্য ও নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার চেয়ারম্যান শিশির ভট্টাচার্য ও সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন তপন রীত।

ব্যাঙ্কের অনুৎপাদক সম্পদ নিয়ে অযথা উন্মাদনা অযৌক্তিক

অতিথি কলম



পারসা ভেঙ্কটেশ্বর রাও (জুনিয়র)

আচ্ছা, নতুন দেউলিয়া আইন (Insolvency Bankruptcy code) কি কোনো ম্যাজিক বুলেট যা দিয়ে 'অনুৎপাদক সম্পদ' (Non-Performing Assets সংক্ষেপে এনপিএ) নামক ভয়ঙ্কর প্রাণীকে এক বুলেটে শিকার করা যাবে? অর্থনীতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া আর সরকারি ব্যাঙ্কগুলি কিন্তু সেরকমটাই বিশ্বাস করে। তা নাহলে অর্থনীতির মলিন মৃত অন্ধগলির শেষে তাদের হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো অনুভূতি হোত না।

উল্লেখিত আই বি সি আইন পাশ হয় গত বছর মে মাসে, কিন্তু এ সংক্রান্ত Banking regulation ordinance জারি করতে সরকারের আরও এক বছর লেগে গেল। এখন আর বি আই ব্যাঙ্কগুলিকে নির্দেশ দিতে পারে যে তারা সরাসরি দেনাদারদের ওপর অর্থাৎ যাদের টাকা অনাদায়ী থেকে এনপিএ হয়ে আছে তাদের ওপর আইবিসি আইন প্রয়োগ করে স্বাধীনভাবে ব্যবস্থা নিক। এমন পাঁচশো বড় অ্যাকাউন্টের সন্ধান পাওয়া গেছে। তার মধ্যে আবার ১২টি রাঘববোয়ালই ওই হদিশ মেলা অ্যাকাউন্টগুলির বকেয়া টাকার ২৫ শতাংশ হজম করে বসে আছে। এরা অবশ্যই আইবিসি-র আওতায় আসতে চলেছে। এমনটা ভাবা ঠিক নয় এর ফলে অনাদায়ী খারাপ ঋণ রাতারাতি উবে যাবে। একটি বেশ এলাহি পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে এই কাজ করতে হবে যার জটিলতাও কিছু কম নয়। ইতিমধ্যে আইবিসি-র অধীনস্থ বোর্ড জানিয়েছে তারা এনপিএ-এর আওতায় আসা কেসগুলিকে fast tracking করবে।

এখন প্রশ্ন উঠছে, সরকারের এই আইবিসি তথা দেউলিয়া আইনের গুরুত্ব ও মহিমা আবিষ্কার করতে এত সময় লাগল কেন? ১৯৯৯ সালেই এটির সূত্রপাত বা আলোচনা স্তরে মাথা তুলেছিল। ১৯৯৯ সালের জুলাই মাসের একটি আরবিআই প্রতিবেদন অনুযায়ী— ''বিশ্বের কিছু কিছু দেশে প্রায় সব ব্যাঙ্ক বা অধিকাংশ ব্যাঙ্কই ঋণের ক্ষেত্রে প্রভিসন করেই থাকে। আর যে মুহূর্তে কোনো সম্পদ লাভজনক না থাকার লক্ষণ দেখায় (এনপিএ) তখনই তাদের রাইট অফ অর্থাৎ খাতায় লোকসান দেখিয়ে মুছে ফেলা হয়। এই সব দেশে ব্যাঙ্কগুলি তাদের ব্যালেন্সশিটে তথাকথিত এনপিএ কখনই বয়ে বেড়ায় না। অন্যদিকে কড়া দেউলিয়া আইন ও মেয়াদের আগে বাধ্যতামূলক ভাবে ঋণ বন্ধ হওয়ার দরুন খুব দ্রুত টাকা পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা শুরু হয়ে যায়। এখানে খেয়াল রাখা দরকার, দেউলিয়া সংক্রান্ত আইন কেবল মাত্র এনপিএ ঋণগ্রহীতাজনিত সমস্যা মেটাতে প্রয়োগ করার জন্যই তৈরি করা হয়েছে এমন নয়। বৃহত্তর অর্থনৈতিক বাজারের কথা বিবেচনা করেই এই আইন আনা হয়েছে, তাই এর প্রয়োগ বহুমুখী।

অর্থমন্ত্রক তাদের ১১ মে ২০১৬ সালে জারি করা নোটে বলেছে— 'এই আইনটি জিএসটি আইনের পরেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বের অর্থনৈতিক সংস্কার'। আইবিসি আইনের উদ্দেশ্য দেশের ব্যবসায়ী মহলে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ ও সরকারের তরফ থেকে মদত দেওয়া হচ্ছে এমন একটা অনুভব বা বাতাবরণ জাগানোর জন্যই করা। সরকারি নোটে বিষয়টা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে 'নতুন আইনটির উদ্দেশ্য নতুন উদ্যোগপতিদের পৃষ্ঠপোষকতা করা। মৌলিক কোনো প্রচেষ্টাকে সাহায্য করা। কিছু কিছু ব্যবসায়িক উদ্যোগ ব্যর্থ হবেই এটা ধরেই নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাদের ব্যর্থতা কাটিয়ে ওঠার ব্যাপারে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। একই সঙ্গে উদ্যোগপতিরা এবং ঋণদাতারা উভয়েই যাতে সামনের দিকেই এগিয়ে যেতে পারে তারই কৌশল বাতলে দেবার ব্যবস্থা থাকছে যাতে অতীতে ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে থাকলেও সব ছেড়ে ছুড়ে বসে না পড়তে হয়।' অবশ্যই এটা একটা বড় সমস্যা কিন্তু তার ফলে উদ্যোগপতি এবং ব্যাঙ্ক উভয়েরই অর্থনৈতিক ঝুঁকিকে এড়িয়ে চললে হবে না।

এনপিএ নিয়ে আশঙ্কার ক্ষেত্রে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মাথায় রাখা আবশ্যক— প্রথম, সমস্ত এনপিএ অ্যাকাউন্ট-ধারীকেই চোর বা অসৎ উদ্দেশ্যে ধার নিয়েছিল এমনটা বিবেচনা করা হয়। অর্থাৎ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ও ঋণগ্রহীতা পরস্পরের মধ্যে ফিটিং করেই জনগণের অর্থ লোটার ব্যবস্থা করেছিল। তারা কখনই ব্যবসায়িক উদ্যোগটিকে যার জন্য ধার নিয়েছিল সেটিকে আন্তরিকভাবে

> "ব্যাঙ্কগুলিকে ব্যবসায়ে ক্ষতি ও ঋণগ্রহীতার ব্যর্থতার বিষয়গুলির ক্ষেত্রে প্রাথমিক দৃষ্টিভঙ্গিরও ঢালাও পরিবর্তন করতে হবে। ভারতের অর্থনীতি নানা ধরনের সম্ভাব্য অর্থনৈতিক ক্ষতি ও কারবারি ব্যর্থতাগুলিকে যদি সহজভাবে তার সিস্টেমের মধ্যে না আত্মসাৎ করতে পারে তাহলে অর্থনৈতিক অগ্রগতিই ব্যাহত হবে।"

সফল করতে চায়নি। বিষয়টা উড়িয়ে দেওয়া যায় না বিশেষ করে সরকারি ব্যয়ে নির্মিত পরিকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে। কিন্তু বাজার অর্থনীতির ক্ষেত্রে ঋণের ঝুঁকি তো অবশ্যম্ভাবী। কেউ যদি সাহস করে ব্যর্থ হতে না এগোয় কেউই তো তবে সফল হবে না। হ্যাঁ, ঝুঁকিকে কখনই হেলাফেলা করে দেখা চলবে না কিন্তু অর্থনৈতিক পরিভাষায় প্রয়োজনীয় ব্যবসায়িক বোধবুদ্ধি, অভিজ্ঞতা প্রয়োগ অবশ্যই করতে হবে। বদ মতলবে ব্যাঙ্কের টাকা না দেওয়া আর সৎভাবে ব্যবসা পরিচালনা করতে গিয়ে পরিস্থিতি সাপেক্ষে ব্যর্থ উদ্যোগপতি— দু'জনের প্রতি প্রতিবিধান এক হতে পারে না। এই তফাতটা গোড়াতেই বুঝে নেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের তরফে একধরনের নজরদারি ব্যবস্থা চালু করা দরকার।

দ্বিতীয়, ঠাণ্ডা মাথায় এনপিএ-জনিত সমস্যার তুল্যমূল্য বিশ্লেষণ দরকার। এখন বুঝতে হবে ২০০৭-৮ সালে মার্কিন মুলুকে Sub-prime-mortgage বিপর্যয়ের (যা এনপিএ-রই আর এক বিদেশি নাম) ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে মহীরুহ সম ব্যাঙ্কগুলি লাটে উঠেছিল ও মার্কিন Federal Reserve কে হস্তক্ষেপ করে তাদের জামিনে খালাস বা এই দেউলিয়া পরিস্থিতি থেকে বের করতে হয়েছিল। ভারতে কিন্তু এনপিএ-র ধাক্কায় ব্যাঙ্কগুলি ভেঙে পড়েনি। তাই অনাদায়ী সম্পদ বা এনপিএ নিয়ে অযথা বুক চাপাড়ানো একটু কমানো দরকার, তুলনায় যথাযথ সমালোচনা বা বিকল্প পথ নির্দেশ জরুরি।

২০১৪-১৫ অর্থবর্ষের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ব্যাঙ্কের মোট ঋণের ৪.৩ শতাংশ অনাদায়ী ও ব্যাঙ্কের সামগ্রিক সম্পদের ২.৭ শতাংশ এনপিএ। এগুলি সবই নথিভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের খতিয়ান। সরকারি ব্যাঙ্কগুলির ক্ষেত্রে এই সংখ্যা যথাক্রমে ৫ শতাংশ ও ৩.২ শতাংশ। পরিসংখ্যান বিচার করলে দেখা যাচ্ছে ২০১৪-১৫-র পরিস্থিতি ২০০৩-০৪ সালের পরিস্থিতির চেয়ে অনেক ভালো। ২০০৩-০৪ সালে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির সামগ্রিক ঋণের শতকরা ৭.২ শতাংশ আর মোট সম্পদের ৩.৩ শতাংশ ছিল এনপিএ-র আওতায়। আর সরকারি (পাবলিক সেক্টর ব্যাঙ্ক) ব্যাঙ্কগুলির মোট ঋণের ৭.৮ শতাংশ ও মোট সম্পদের ৩.৫ শতাংশ ছিল এনপিএ। তফাতের এই শতাংশগুলিকে যদি টাকায় পরিবর্তন করা যায় তাহলে অঙ্কগুলো বেশ কয়েক হাজার কোটি টাকায় দাঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু নিত্যদিনের ব্যাঙ্কিং লেনদেনের ক্ষেত্রে এই পরিসংখ্যানগুলি অনেক গা-সওয়া চেহারায় নেওয়া হয়। কেননা আর বি আই-এর দেওয়া হিসেব অনুযায়ী ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৮ অবধি পরিস্থিতি ছিল আরও ভয়াবহ। পরিসংখ্যানগুলিই কথা বলবে। সামগ্রিক এনপিএ ২৩.২ শতাংশ (১৯৯৩), ২৪.৮ শতাংশ (১৯৯৪), ১৯.৪ শতাংশ (১৯৯৫), ১৮ শতাংশ (১৯৯৬), ১৭.৮ শতাংশ (১৯৯৭) আর ১৬ শতাংশ (১৯৯৮)।

গত ৫ বছর ধরে একটা যুক্তি খুব জোরদারভাবে বাজারে চলছে যে দানবীয় চেহারার বিপুল এনপিএ বৃদ্ধির জন্যই ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ দেওয়া বিশেষ করে সরকারি ব্যাঙ্কগুলি থেকে তো বটেই ভীষণভাবে কমে এসেছে। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে এনপিএ সমস্যার শীঘ্র ও যথাযথ সমাধান করতেই হবে, কিন্তু একই সঙ্গে ব্যাঙ্কগুলিকে ব্যবসায়ে ক্ষতি ও ঋণগ্রহীতার ব্যর্থতার বিষয়গুলির ক্ষেত্রে প্রাথমিক দৃষ্টিভঙ্গিরও ঢালাও পরিবর্তন করতে হবে। ভারতের অর্থনীতি নানা ধরনের সম্ভাব্য অর্থনৈতিক ক্ষতি ও কারবারি ব্যর্থতাগুলিকে যদি সহজভাবে তার সিস্টেমের মধ্যে না আত্মসাৎ করতে পারে তাহলে অর্থনৈতিক অগ্রগতিই ব্যাহত হবে।

তাই বলা দরকার, দেশকে যদি এগিয়ে যেতে হয় তাহলে দেশের লোক, সরকার ও বিশেষ করে কারবারিদের ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতা এড়িয়ে চললে চলবে না। সকলকেই ঝুঁকি নিতে হবে। এটিই উন্নয়নের আবশ্যিক শর্ত।

Top Star Lightings



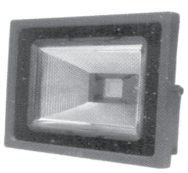

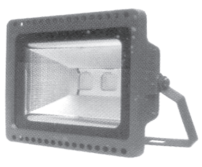

55, Ezra Street (Yamuna Bhawan)
1st Floor, Kolkata - 700 001
Ph. : 033-4024 1061, SMART# 1061
E-mail : topstarlightings@gmail.com

‘চতুর বানিয়া’

ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ বলেছেন, গান্ধীজী একজন ‘চতুর বানিয়া’ ছিলেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল থেকেই তার প্রতিবাদ করা হয়েছে। কেউ কেউ আবার তীব্র ক্ষোভ জানিয়ে অমিত শাহকে তার মন্তব্য ফিরিয়ে নিয়ে ক্ষমা চাইতে হবে বলে দাবি করেছেন।

অমিত শাহই কি গান্ধীজী সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য প্রথম করলেন? তা তো নয়। ঋত্বিক ঘটকের মতো একজন চিত্র পরিচালক তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, ‘descendant of pig,’ ‘গে রাইটস্’-এর কর্মী অশোক কবি বলেছেন, ‘bastard bania,’ উত্তরপ্রদেশের দলিত নেতা কাশীরাম বলেছেন, ‘গুজরাঠী বানিয়া’। উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী বলেছেন, ‘নাটকবাজ’। এ তথ্য পরিবেশিত হয়েছিল শেখ সদর নইম-এর লেখা ‘Why this attack on Gandhi ?’ শিরোনামে ‘দি স্টেটসম্যান’ পত্রিকার ২রা জুলাই, ২০০৯ সংখ্যায় নাতিদীর্ঘ এক প্রবন্ধে। প্রয়াত বিপ্লবী ও লেখক প্রিয়রঞ্জন কুণ্ডুর ‘যে মহাত্মা সারাজীবন দ্বিচারিতা করে গেছেন’ গ্রন্থে ১০১ পৃষ্ঠায় এসব উল্লিখিত আছে।

প্রিয়রঞ্জন কুণ্ডু পূর্বোক্ত গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখেছেন, ‘এতৎসত্ত্বেও একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে ভারতমাতার দুই কুলাঙ্গার সন্তান সম্পর্কে দু’চার কথা বলে না গেলে দেশবাসী আমায় ক্ষমা করবেন না।’ তাঁর কথায় উক্ত দুজন কুলাঙ্গারের মধ্যে একজন হলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। তাহলে এ ধরনের মন্তব্য প্রথমও নয়, নতুনও নয়।

আর গুজরাটিদের কাছে ‘চতুর বানিয়া’ সম্বোধন কোনো অপমানজনক কথা নয়।

—শান্তি কুমার পান,
রাওতরী, সালার, মুর্শিদাবাদ।

সাপ্তাহিক রেশন ব্যবস্থা

বাল্যকালে প্রতি সপ্তাহে রেশন তুলতে যাওয়ার বিবরণ তুলে ধরবার চেষ্টা করছি। এই বিবরণ অনেক পাঠকের মনের কথা এ আমার একান্ত বিশ্বাস। আমাদের বালক অবস্থায় রেশন কার্ডে বিপিএল বা এপিএল নামক ব্যবস্থা ছিল না। তবে শাসক রাজনৈতিক দল ও রেশন ডিলারের একটি চুরির মৌ পত্র স্বাক্ষর তখনও ছিল এখনও আছে। আমাদের সময় ছিল (ক) (খ) (গ) (ঘ) এই ভাবে। কার্ডগুলির অগ্রভাগে ব্লু রাবার স্টাম্পের ছাপ থাকত এবং তা দিয়ে কোন গ্রাহক কত পরিমাণ কেরোসিন, কত পরিমাণ চিনি, চাল, ডাল, গম পাবে তা নির্ধারণ হোত। আমাদের বালক অবস্থায় (ক) শ্রেণীর কার্ডগুলোর অর্থ— আর্থিক দিক



থেকে সঙ্গতি সম্পন্ন পরিবারের কার্ড। সতিকারের আর্থিক সঙ্গতি সম্পন্ন না হয়েও গ্রাম পঞ্চায়েত, প্রঞ্চায়েত প্রধান ও রেশন ভিলারের চুরির মৌ স্বাক্ষরের এই দলিল আজও চলমান— সত্যি হাসি পায়! এরা ধনীকে গরিব বানায় স্বজনপোষণের জন্য। আবার গরিবকে ধনী করে স্বজনপোষণ ও ভোটের কথা মাথায় রেখে। আমাদের গ্রামে শনি ও রবিবার কখনো বিকালে আবার কখনো সকালে রেশন দিত এবং এই রেশন তোলার দুশ্চিন্তা সারা সপ্তাহ ধরে চলত। শনিবার এবং রবিবার দুটোদিনের কমপক্ষে ২ ঘণ্টা করে সময় ব্যয় হোত এই রেশনের জন্য। কিন্তু এই রেশনের বরাদ্দ জিনিস যে খুব আমাদের পরিবারে প্রয়োজন ছিল তা কিন্তু নয়। প্রয়োজন ছিল কার্ডটুকুর অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার জন্য। প্রয়োজন ছিল গ্রামীণ নাগরিকত্ব বাঁচিয়ে রাখা। তাই প্রতি সপ্তাহে এই রেশন ধরার ন্যায় কষ্টকর কাজটি যাঁরা করেছেন তারা আমার অভিজ্ঞতার শামিল। এখন রেশন দোকানে ভিড় কিছুটা কম হয়েছে, তার কারণ আধারকার্ড পরিচয় এবং নাগরিকত্বের তালিকায় ১ম স্থান পাওয়ায় রেশন কার্ডটি আর আগের মতো গুরুত্ব বহন করে না। এখন আমাদের পশ্চিমবাংলার ৬০ শতাংশ মানুষ রেশনের দিকে খুব একটা না তাকালেও এইটুকু প্রয়োজনে তারা আর আগের মতো লাইন দিয়ে সময় অতিবাহিত করে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাড়ির কাজের লোকেরা বিভিন্ন লোকের কার্ড সংগ্রহ করে কেরোসিন ও গম চাল তুলে খোলা বাজারে বিক্রি করে দু’ পয়সা আয় করে। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের ভরতুকি যুক্ত খাদ্য প্রদানের যে প্রক্রিয়া তা সরাসরি গ্রাহকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অর্থের মাধ্যমে প্রদান করলে তবে প্রতিটি গ্রাহক আত্মসম্মানের সঙ্গে সরকারি সহযোগিতা পাবে এবং শাসক রাজনৈতিক দলের স্বজনপোষণ এবং ডিলার ও পার্টির নেতার চুরির মৌ পত্র স্বাক্ষরের জীবন্ত দলিল বন্ধ করা যাবে। অন্যথায় ডিলার যেমন জনসাধারণের খাদ্য খোলা বাজারে বিক্রি আগের মতোই করবে, তেমন রাজনৈতিক দল সেখান থেকে ভাগ নেবে। রয়েছে আরও নানাবিধ ত্রুটি। তাই সরকারের দেখা উচিত এখন ভারতবর্ষের কত মানুষ স্বেচ্ছায় ভরতুকি যুক্ত রেশন ছেড়ে দিতে চায়।

তাহলে দেখা যাবে ভারতে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩০ শতাংশ ভরতুকি যুক্ত রেশন ছেড়ে সরকারের পাশে দাঁড়াবে। যেমন ভাবে দাঁড়িয়েছে ১ কোটি মানুষ গ্যাসের ভরতুকি ছেড়ে।

—মদনমোহন সিংহ,
ডুমুরজলা, হাওড়া।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

ন হিন্দু আতঙ্কি ভবেৎ

অমিতাভ সেন

আমরা ইতিহাসে একটা 'অন্ধকারময় যুগ'-এর কথা পড়ে থাকি। ইউপিএ-র দশ বছর শাসনকালে অন্ধকার আরও গাঢ় হতে দেখেছি। একটা নতুন তত্ত্বকে এ যুগে প্রতিষ্ঠা করার অপচেষ্টা হয়েছে। সেটা হলো হিন্দু টেরর। দিগ্বিজয় সিংহ, চিদাম্বরম, মণিশঙ্কর আইয়ার প্রমুখ ১০নং জনপথের দাসানুদাসেরা এই অপ-তত্ত্বের প্রবক্তা। এর কল্পরূপ দেবার জন্য দু'দুটো ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র ফাঁদা হয়। একটা মালেগাঁও ব্লাস্ট, অপরটা সমঝোতা এক্সপ্রেস বিস্ফোরণ। ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মালেগাঁওয়ে এক মসজিদের পাশে দ্বিচক্রযানে রাখা আইইডি থেকে প্রবল বিস্ফোরণ হয়, প্রায় ৩৭ জন নিহত এবং ২৫০ জন আহত হন। এর পরের অপকর্ম ২০০৭ সালে সমঝোতা এক্সপ্রেসে বিস্ফোরণ। স্যুটকেসে বোমা ছিল, ৬৮ জন নিরীহ মানুষ প্রাণ হারান। এই দুটি ঘটনায় হিন্দুত্ববাদী সমাজকর্মী স্বামী অসীমানন্দ, সাধ্বী প্রজ্ঞা ভারতী, সেনাবাহিনীর যশস্বী সৈনিক কর্নেল পুরোহিত ও আরও অনেক দেশপ্রেমী মানুষকে মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। হিন্দুত্ববাদী চিন্তাধারা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার ও প্রসারে এঁরা এত প্রবল ভূমিকা নিয়েছিলেন যে পরিবার সর্বস্ব কংগ্রেসিদের চক্ষুশূল হয়ে পড়েন। সাধ্বী প্রজ্ঞা আজ আদালতের আদেশে মুক্ত হলেও জেলে দশ বছর অবর্ণনীয় নির্যাতনের ফলে কয়েকজন সহায়িকার সাহায্য ছাড়া হাঁটাচলা করতে পারেন না। সমঝোতা এক্সপ্রেস কাণ্ডের পেছনে যে ষড়যন্ত্র ফাঁদা হয়েছিল আজ তার পর্দা ফাঁস হয়েছে।

এই জঘন্য সমঝোতা এক্সপ্রেস কাণ্ডে দুজন পাকিস্তানি আজমত আলি ও মহম্মদ ওসমান আচারি স্টেশনের কাছে ধরা পড়ে। আজমত লাহোরের অধিবাসী আর ওসমান করাচীর বাসিন্দা। পঞ্জাব পুলিশ এদের যখন ধরে তখন কোনো বৈধ কাগজ এদের কাছে ছিল না। হরিয়ানা এটিএস-এর তদন্তে প্রকাশ পায় আজমত দিল্লির প্যাটেল নগরে রাজেশ খান্না নাম নিয়ে ডেরা বেঁধেছিল। এই মামলায় ইনভেস্টিগেটিং অফিসার ছিলেন গুরদীপ সিংহ। প্রতক্ষ্যদর্শীরা তাঁকে জানান যে আজমত একটা বড়ো স্যুটকেস গাড়ির কামরায় ঢোকায়, তার কী-হোল দিয়ে এক ধরনের ফ্ল্যাশ দেখা যাচ্ছিল। অথচ পুলিশ চারদিনের পর আজমতের রিমান্ড চায়নি। ওসমান ১৬ দিন পর জামিন পায় এবং দুজনেই উধাও হয়ে যায়। তৎকালীন এসপি ভারতী অরোরা দাবি করেন, সমঝোতা এক্সপ্রেস কাণ্ডে পাকিস্তানের কোনো ভূমিকা নেই। গুরদীপ কবুল করেন, উপরওলার চাপেই তিনি জামিনের বিরোধিতা করতে পারেননি। অথচ বৈধ কাগজ না থাকার অপরাধে তাদের হাজতে রাখা যেতো। এইসব ঘটনাসূত্রকে episodical নজরে না দেখে comprehensive দৃষ্টিতে বিচার করা উচিত। ইউপিএ সরকার ক্ষমতায় আসার পরই SIMI-র ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়। সিমির শীর্ষ নেতা সফর রাজের আজমেড় ব্লাস্ট কাণ্ডে ধরা পড়ে। ২০০৯ এলাগোরি স্বীকারোক্তি দেয় যে আগের দুটো ঘটনায় পাকিস্তানের হাত ছিল। পাকিস্তানের ইন্টারন্যাল সিকিউরিটি মিনিস্টার আজমত ওসমানের ভূমিকা অস্বীকার করেনি, অবশ্য তাদের ননস্টেট অপারেটরস বলেছিল। এর আগে US Treasury bench ওসমান হেডলি ও আজমতকে দোষী ঘোষণা করেছিলেন। হেডলির তিন নম্বর স্ত্রীও স্বামীর কুকীর্তি ফাঁস করে।

এসব সত্ত্বেও এক শ্রেণীর স্যুডো সেকুলারিস্ট ও কংগ্রেসনেতা হিন্দু টেরর নামে এক ভুয়ো তত্ত্ব ছড়িয়ে বাজার গরম করতে চায়। যেসব ফাউন্ডেশনের টাকায় এই বুদ্ধিজীবীরা বিদেশ যান, অখাদ্য বই লঞ্চ করেন সেইসব ফাউন্ডেশন চলে আরব তেলের ফান্ডিংয়ে। নোয়াম চমস্কি পণ্ডিত হতে পারেন, কিন্তু ভারতের রামা কায়েত, হাসেন শেখের ভালোমন্দে তাঁর কোনও আগ্রহ নেই। অথচ 'ভারত তেরে টুকরে হোঁঙ্গে—ইনশাল্লা' স্লোগানের বিরুদ্ধে সমস্ত জাতি গর্জে উঠলে, নোয়াম এবং আরও ৬৩ জন বুদ্ধিজীবী জেএনইউ-এর শয়তানদের দরদে 'অসহিষ্ণুতা'র বিতর্ক তোলেন। বাটালা হাউস সন্ত্রাসবাদীদের কথা সলমন খুরশিদের কাছে শুনে সোনিয়া গান্ধীর চোখ সহানুভূতির জলে ভরে ওঠে। সারাবিশ্ব যাকে ঘৃণা করে সেই ওসামাকে দিগ্বিজয় সিংহ 'লাদেনজী' বলে। সন্ত্রাসি খোঁয়াড়ের মালিক জাকির নায়েকের উচ্চ প্রশংসা করে। জনগণের আশীর্বাদে প্রতিষ্ঠিত মোদী সরকারকে উৎখাত করতে মণিশংকর আইয়ার পাকিস্তানের সাহায্য চায়। বউ নিয়েছে সারদার সুদীপ্ত সেনের কাছে এক কোটি টাকা, বাপ অর্থমন্ত্রী থাকার সময় ছেলে দালালির টাকা নিয়ে কীর্তি রেখেছে এবং ধরা পড়েছে। কাজেই চিদাম্বরমের হাতে হিন্দু সন্ত্রাসের কাল্পনিক গালগল্প প্রচার করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। এদের বক্তব্যের বর্ণচ্ছটা সরল সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে। আমাদের শাস্ত্রে বলা আছে : হিরন্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতম্ মুখম্। অর্থাৎ স্বর্ণময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ ঢাকা থাকে। সাধনার দ্বারা আবরণ উন্মোচন করলেই সত্য প্রকাশিত হয়, যা আজ হয়েছে। এর জন্য অনেক মূল্য দিতে হয়েছে সাধ্বী প্রজ্ঞা, স্বামী অসীমানন্দ, কর্নেল পুরোহিতকে। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গেই বলেছেন— 'মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে দুর্বলের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন।' আমাদের প্রার্থনা— 'দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল আলোক, তবে তাই হোক, তবে তাই হোক'। ▮



হিন্দুত্বের ঐতিহ্য রক্ষা করে চলেছে বালীদ্বীপ

স্বপন দাস

ইন্দোনেশিয়ার ১৩৫০০ দ্বীপের মধ্যে একটি দ্বীপের নাম আমরা জানি সকলেই। অন্য দ্বীপগুলির থেকে এটি হিন্দুদের একটু কাছের। যে দ্বীপে সারাবিশ্বের পরিব্রাজক হিন্দুরা বেড়াতে এসে একটু প্রাণভরে নিশ্বাস নিতে পারে। এর কারণও আছে। এই দ্বীপটি সারা বিশ্বের হিন্দুদের কাছে, তাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, আর যে ধারা বেদ বেদান্তের আবেশের শিক্ষায় প্লাবিত হয়, সেই ধারাকে শত লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে রক্ষা করছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। হিন্দুত্ব রক্ষার সেই লড়াইয়ের ছোঁয়া পাওয়া যায় এখানেই। হয়তো একমত অনেকেই হবেন না। তবুও এই দ্বীপটি সারা বিশ্বের হিন্দুদের কাছে একটি বলার মতো ক্ষেত্র।

ইন্দোনেশিয়ার এই দ্বীপটির নাম বালী। আমাদের কাছে পরিচিত দ্বীপ জাভা, সুমাত্রা, জাকার্তা তো আছেই। তাহলে এই দ্বীপটি নিয়ে এত কথা কেন? ইন্দোনেশিয়া হচ্ছে একটি মুসলমান দেশ। ১৩৪৯৯ দ্বীপে রয়েছে মুসলমান সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রকটতা। আর এরকম দেশে গিয়ে একটি একেবারে হিন্দু প্রদেশ কল্পনা করাও স্বপ্নের অতীত। শুধু তাই নয়, এখানকার হিন্দুরা এতটাই নিজের ধর্মের প্রতি অনুরক্ত, যে-কোনো কিছুর প্রভাব, হুমকি বা রাজনৈতিক নির্দেশকেও তোয়াক্কা করেন না। নিজের ধর্মকে রক্ষা করার জন্য কোনো সমঝোতার রাস্তাতেও হাটেননি এই প্রদেশের মানুষ। বালীতে গিয়ে একজন মানুষ তাদের সৌন্দর্যবোধ, প্রকৃতির প্রতি তাদের ভালবাসা, একজন পর্যটককে কল্পনাতীত আপ্যায়ন, আর হিন্দু ধর্মের মূল যে বিষয়— মানব সেবাই পরম ধর্ম, তার পরিচয় পাবেন। সারা বালী জুড়ে রয়েছে বহু হিন্দু মন্দির। এইসব মন্দিরের নির্মাণশৈলী এবং মন্দিরগাত্রের অলঙ্করণ ও ভাস্কর্যের যে সমাহার, তা একদিকে যেমন মুগ্ধ করবে, তেমনি আপনাকে ভাবাবে আর মনের মধ্যে এই প্রশ্ন বারে বারে উঁকি দেবে, 'কী করে এই প্রদেশের মানুষেরা হিন্দু ধর্মের প্রতিটি ধারাকে মেনে চলছেন?' এখানেই বালীর মানুষের সাহসিকতাকে বাহবা না দিয়ে পারবেন না সারা বিশ্বের হিন্দু ধর্মের মানুষজন। শতাব্দীর পর শতাব্দীর এ এক পরম্পরা রক্ষার লড়াই। সেই পরম্পরা লুকিয়ে রয়েছে তাদের প্রবহমান দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায়। প্রতিটি পদক্ষেপে, প্রতিটি আচার, প্রতিটি আচরণে আর পালনীয় কর্তব্যে— বেদান্তের শিক্ষায় দায়িত্ববোধের ধারায়। বালীর মানুষেরা বিশ্বাস করেন, তাদের জীবনশৈলীর এই যে ধারা তা সবই বেদকে অনুসরণ করে। এখানকার সব বিদ্যালয়ে পুরাণ পড়ানো আবশ্যিক। এখানে বিদ্যালয় স্তরে পড়ানো হয় মার্কণ্ডেয়, ভরদ্বাজ, অগস্ত্যর মতো বৈদিক ঋষিদের কথা, তাঁদের জীবনচরিত। তারা মনে করেন, ভারত হচ্ছে বেদান্ত শিক্ষার ও তার অনুশীলনের কেন্দ্রস্থল। অথচ সেখানে ধর্মীয় সমঝোতা এমন একটা পর্যায়ে চলে গেছে যে সেটির অনুশীলন বা চর্চা একেবারে হয় না বললেই চলে। ফলে ভারতের যুব সম্প্রদায় বেদান্তের অন্তর্নিহিত যে শিক্ষা, সেই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। বেদান্তের এই শিক্ষা একজন মানুষকে সবদিক দিয়ে শক্তিশালী করে তোলে, ধর্মীয় চেতনা মানুষটিকে করে তোলে দৃঢ়চেতা, এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া সহনশীলতার সংমিশ্রণে একজন হয়ে ওঠেন আত্মনিয়ন্ত্রণকারী। বেদান্তের এই শিক্ষাই সারা পৃথিবীর রক্ষাকবচ। এমনটাই মনে করেন বালীবাসী। তবে তারা নিজেরা নিজেদের ইন্দোনেশীয় বলে গর্ব করতে, দেশকে মাতৃভূমি হিসাবে সম্মান করতে এক মুহূর্তের জন্য দ্বিধাবোধ করেন না।

বালীতে একটি প্রথা দেখে অবশ্যই সবার ভাল লাগবে। এখানে যে-কোনো মন্দিরে ঢোকার জন্য বিশেষ পোশাক আছে। সেই পোশাক ছাড়া মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ। এই লৌকিক পরম্পরা বালীবাসী শতাব্দীর পর শতাব্দী মেনে আসছেন। প্রতিটি মন্দিরে ঈশ্বর আরাধনা হয় নিষ্ঠা সহকারে এবং বেদ বা বেদান্তের সব নিয়ম মেনে। ফলে একটু বেশি সময় লাগে। এখানকার মানুষ এতটাই ধর্মপ্রাণ যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে তারা সেই অর্চনাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করে। বিরক্তি প্রকাশ করেন না কেউ।

একটি ঘটনার কথা এই প্রসঙ্গে বলা দরকার। ১৯৮৯ সালে বালীতে একটি বিশাল জগন্নাথ মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়। সমস্ত বালীবাসী এই মন্দির নির্মাণে অংশ নিয়েছিলেন। সবাই তাঁদের ক্ষমতা অনুযায়ী একদিকে যেমন শ্রমদান করেছিলেন, তেমনি প্রতিটি পরিবার এক বা একের অধিক শিলা দিয়েছিলেন মন্দির নির্মাণে। সবচেয়ে অবাক করার মতো বিষয়, এই মন্দিরের পরিচালনার ভার দেওয়া হয়েছে বালীর মহিলাদের হাতে।

বালীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যেও রয়েছে হিন্দু দেবদেবী ও তাঁদের কেন্দ্র করে বিভিন্ন গাথার প্রভাব। আর সেটার প্রতিফলনও দেখা যায় তাঁদের নৃত্যশৈলীর মধ্যে। পোশাক -আশাকেও থাকে দেব-দেবীর রূপক। এই নৃত্যশৈলী সারা পৃথিবীকে চমকিত করে। আর বিশ্বের মানুষের কাছে এই নৃত্যশৈলীর মাধ্যমে পৌঁছে যায় হিন্দু ধর্মের নানা দিকের নানা কথা। ▮

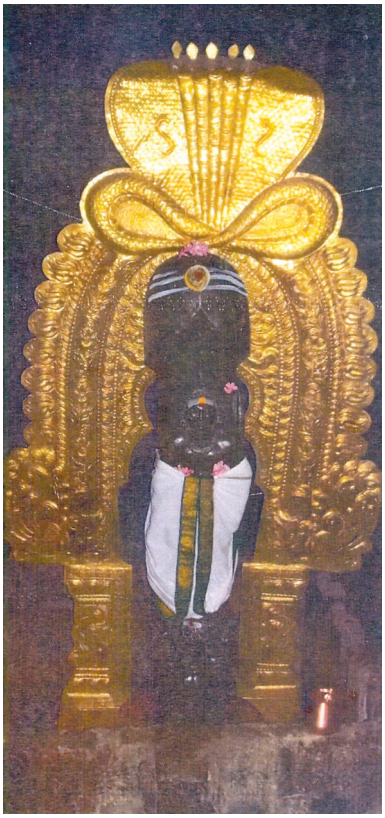

গুড়িমল্লমের শিবলিঙ্গ

সৌমেন নিয়োগী

সনাতন ধর্মে ত্রিমূর্তির অন্যতম দেবতা শিব বা মহেশ্বর, অমূর্ত লিঙ্গপ্রতীক রূপে প্রাক্-হরপ্পা যুগ থেকে শুরু করে প্রসারিত হয়ে আজও ভক্তদের মধ্যে পূজ্যবস্তু হিসেবে অনেক সজীব ও তাৎপর্যপূর্ণ।

'শংকরপ্রতিমায়াস্তু লিঙ্গ পূজা সরীয়সী'— অর্থাৎ প্রতিমার চেয়ে লিঙ্গ প্রতীকে শংকরের পূজা শ্রেয়, 'লিঙ্গ সাক্ষান্মহেশ্বরঃ'— লিঙ্গই সাক্ষাৎ মহেশ্বর। অখণ্ড ভারতবর্ষে আসিন্ধু হিমাচল সর্বত্রই এই লিঙ্গরূপে শিবের পূজা অর্চনা বাস্তবে সেই সভ্যতার ঊষালগ্নে 'জগতঃ পিতরৌ' চিন্তন ও মনন শক্তিই প্রাক্-হরপ্পা ধর্ম সংস্কৃতির ঐতিহ্যেরই এক নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন শৈবমন্দির ও দেবালয়ে স্বমহিমায় পূজিত হয়ে আসছে।

শিবের মূর্ত রূপ অপেক্ষা অমূর্ত রূপই পূজ্য হিসাবে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সেই আদি পিতার রূপ কল্পনার্থে মুক্ত মুখচর্ম পুং জননেন্দ্রিয় রূপে কল্পিত মূর্ত ও অমূর্তের উপস্থাপনায় অনন্য। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয়— প্রথম শতাব্দীর অন্ধ্রপ্রদেশের গুড়িমল্লমের শিবলিঙ্গ হলো প্রাচীনতম, যা পরবর্তীকালে মুখলিঙ্গ ও লিঙ্গোদ্ভব মূর্তির রূপকল্পনায় প্রেরণা জুগিয়েছে। 'জগতঃ পিতরৌ' অর্থাৎ জগৎপিতা ও জগন্মাতার রূপ কল্পনার ঐতিহাসিকতার অনুসন্ধান সেই হরপ্পা খননের অবশেষ প্রাপ্ত বস্তু থেকে শুরু যা খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের শাতবাহন রাজাদের আমলে নির্মিত অধুনা অন্ধ্রপ্রদেশের গুড়িমল্লম গ্রামের শিবলিঙ্গ সেই প্রাচীন চিন্তনের এক পূর্ণতা স্বরূপ। "The presence of ithypallic pillars throughout the Harappan ruins would tend to reinforce the significance of phallie Symbolism to these Indus people and their influence on Siva-worship in later Hinduism." "No doubt, the Siva as the Linga at Gudimallam, which is ascribed to 2nd-1st century B.C., should he considered as the earliest specimen of Satavahana art relating to Hinduism in the south". "The iconography of the Siva lings, based on the Vedic concepts of Agni and Rudra, and the anatomy of the figure, so akin to the Yaksha models bespeak of its early origin". নিদর্শন অনুযায়ী শিবলিঙ্গ দুই প্রকার— (১) স্বয়ম্ভুলিঙ্গ ও (২) মনুষ্যলিঙ্গ। স্বয়ম্ভুলিঙ্গের অপেক্ষা মনুষ্য-লিঙ্গ সংখ্যায় বেশি এবং তা প্রথমে মাটিতে বা বেদীতে স্থাপন করা হোত। সেই নিরিখে গুড়িমল্লমের লিঙ্গটি সরাসরি মাটিতে প্রথিত। গুড়িমল্লমের শিবলিঙ্গ আজও নিত্য পূজিত। ভূমিতে অধিষ্ঠিত মূর্ত-অমূর্ত দেবপ্রতিমা পরবর্তী চোল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় পরশুরামেশ্বর মন্দির রূপে আবৃত হয়ে আজও পূজিত হচ্ছেন। "মুক্ত মুখ চর্ম মানব জনন যন্ত্রের আকৃতির নির্মিত এই বিশাল শিবলিঙ্গের (পাঁচ ফুট উচ্চ) গায়ে খোদিত স্বচ্ছ বাস পরিহিত একটি দ্বিবাহু মানুষ, মাথায় বড়োমাপের জটা, ডান হাতে ধরা একটি মেষ (মেষের মুখ নীচের দিকে, পিছনের পা দুটি হাতে রয়েছে)। বাম হাতে একটি বারি পাত্র, বাম বুকে ও কাঁধের উপরে রূপায়িত এই মনুষ্যদেহী মহাদেব দাঁড়িয়ে আছেন বামনাকৃতি একটি নরপুঙ্গবের উপরে, সমকালীন ভারহূতের ভাস্কর্যে যার আত্মীয়রা পরিদৃষ্ট এবং যার উত্তরপুরুষ তামিলনাড়ুর ব্রোঞ্জ ভাস্কর্যের নটরাজের পায়ের তলায় দৃশ্যমান।" অন্ধ্রপ্রদেশের রেণুগুন্টায় অবস্থিত গুড়িমল্লম শিবলিঙ্গের পূজা অর্চনা ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাচীন ধর্মীয় সংস্কৃতির ধারা বহন করে চলেছে আজও নিরবচ্ছিন্নভাবে। "This anthropomorphic lings is possibly the oldest cult image in the Indian subcontinent to have been under continous worship without interrruption for over 2000 years."

বিদেশি মনীষীদের চোখে ভারত

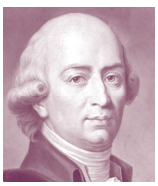

জোহান গটফ্রিড হার্ডার : (১৭৪৪-১৮০৩)

পরিচিতি : ইনি ছিলেন জার্মানির শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, ধর্মতত্ত্ববিদ, কবি ও সাহিত্য সমালোচক। তিনি ছিলেন ইউরোপের 'জ্ঞানোদয় কালের' পুরোধাপুরুষ। তাঁর লেখা পুস্তকগুলি পরবর্তীকালে হেগেল এবং গ্যেটেকে বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল।

উদ্ধৃতি : মনুষ্য জাতির উৎপত্তিস্থল হচ্ছে ভারতবর্ষ যেখানে মানুষ অর্জন করেছিল তার সদ্‌গুণ ও প্রজ্ঞার প্রথম পাঠ। অকপটে স্বীকার করতে হয়, আমাদের ইউরোপীয় সভ্যতার হিমশীতল দর্শনের মধ্যে সমতুল্য সরলতা, সাহস এবং মাহাত্ম্যের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া ভার।

উৎস : সাক্রেড জুয়েল অব যোগা ঃ উইসডোম ফ্রম ইন্ডিয়ান বিলাভেড স্ক্রিপচারস অ্যান্ড টিচারস্— দাভে দ্য'লুক।

উদ্ধৃতি : যেখানে শকুন্তলা তার হারিয়ে যাওয়া সন্তানের সঙ্গে বাস করে, যেখানে 'দুষ্যন্ত' তার প্রেয়সীকে পুনরায় ফিরে পায়, দেবতার কাছে করে অনুনয়, আমি তোমায় অভ্যর্থনা করি ও ভারতবর্ষ। ওহে ওঁঙ্কারের অগ্রদূত। আমার হৃদয়ের আকুতি কি শুনতে পাও? আমাকে উত্তোলন কর, আমাকে নিয়ে চল সেই খানে, ওই স্বর্গলোকে।

উৎস : হার্ডারের লেখা 'শকুন্তলার' প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপক কবিতা 'ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য জার্মান্‌স' : ৫০০ বৎসরের ইন্ডো-জার্মান সম্পর্ক— ওয়াল্টার লেইফার।



এলা হুইলার উইলকস্ : (১৮৫০-১৯১৯)

পরিচিতি : ইনি ছিলেন আমেরিকার অতীন্দ্রিয়বাদী মহিলা কবি এবং সাংবাদিক। বিংশ শতাব্দীর আমেরিকাতে পুনরায় 'রোসিক্রুসিয়ান' আন্দোলনের পুরোধা তিনি ছিলেন। তাঁর বিশেষ অবদানটি হলো, 'পোয়েমস অ্যান্ড প্যাসান'।

উদ্ধৃতি : ভারতবর্ষ হলো বেদের উৎপত্তিস্থল। বেদে পূর্ণ জীবনের প্রয়োজনীয় ধর্মীয় নিয়মশৃঙ্খলাগুলিই শুধু বর্ণিত হয়নি, তাতে আছে বিজ্ঞান প্রমাণিত রেডিয়াম, বিদ্যুৎ, আকাশযান ইত্যাদির বর্ণনা যা বেদের সৃষ্টিকর্তা সেই মহান ঋষিরা প্রাচীনকালেই লিখে গেছেন।

উৎস : ইন্ডিয়ান সিস্টেম অফ্ সাইকোথেরাপি— প্রকাশ বীরেশ্বর।



অ্যালডাস হাক্সলে : (১৮৯৪-১৯৬৩)

পরিচিতি : ইনি ছিলেন ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক, সাহিত্য সমালোচক এবং দার্শনিক, যাঁর রচনাগুলি পরবর্তীকালে মহাপণ্ডিত যেমন জর্জ ওরেল ও হিউস্টন স্মিথকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করতে পেরেছিল।

উদ্ধৃতি : ভগবৎ গীতার সুসংবদ্ধ বিবৃতি যেন মানবজাতির ধর্মীয় উত্থানের জন্য দেওয়া এক অমূল্য উপহার। ভগবৎ গীতা মানবজাতির ধর্মীয় চেতনার বিকাশের জন্য সৃষ্ট সর্বোত্তম, বিশুদ্ধ ও বিস্তৃত আধ্যাত্মিক চিন্তার সারাংশ।

উৎস : সাক্রেড জুয়েল্‌স অফ্ যোগা— দাভে দ্য'লুক।

উদ্ধৃতি : বিশ্বের একমাত্র অক্ষয় ও অব্যয় দর্শনশাস্ত্রের গূঢ় তত্ত্বটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে সংস্কৃত ভাষায় উচ্চারিত হয়েছে : তত্ত্বমসি = তুমিই সেই; সেই আত্মা, যিনি পরিব্যপ্ত সর্বত্র, তিনি শাশ্বত সত্তা; তিনি ব্রহ্ম; তিনি পূর্ণতত্ত্ব; সব কিছুর অস্তিত্বও তিনি; জীবের অন্তিম স্থলও তিনি; তাই স্বয়ংকেই অনুসন্ধান করতে হবে তিনি কে?

উৎস : দ্য কমপ্লিট ইডিয়টস্ গাইড টু হিন্দুইজম্— লিন্ডা জন্‌সেন।



কাউন্ট মরিস মেটারলিংক : (১৮৬২-১৯৪৯)

পরিচিতি : তিনি ছিলেন প্রখ্যাত বেলজিয়ান নাট্যকার, কবি এবং প্রবন্ধকার। তিনি ফরাসি ভাষায় লিখে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান ১৯১১ সালে। তাঁর লেখা বিখ্যাত পুস্তক 'দ্য ব্লু বার্ড' যা দু'বার চলচ্চিত্রে দেখানো হয়েছে।

উদ্ধৃতি : এটা কি ঠিক না 'আকাশ'তত্ত্ব যাকে আমরা অপটুভাবে ইথার বলি, যা সমস্ত কিছুরই উৎস স্বরূপ এবং যাকে আমাদের বিজ্ঞানও স্বীকার করতে শুরু করেছে? এটা কি সত্য যে আইনস্টাইনের সাম্প্রতিক আবিষ্কার ইথারকে অস্বীকার করে? তরঙ্গ শক্তি যা দৃশ্যমান আলোকের অন্য এক রূপ এককভাবে সম্প্রসারিত হয় অনন্ত শূন্যের মধ্য দিয়ে, তবে কি হিন্দুদের আকাশতত্ত্ব আর আধুনিক বিজ্ঞানের ইথারতত্ত্ব এক বস্তু নয়? আকাশ হচ্ছে আরও বেশি সূক্ষ্ম, অশরীরী, দিব্য আর অধ্যাত্মিক ভাবে অনন্ত, অজ, নিত্য ও অবিনাশী।

উৎস : দ্য গ্রেট সিক্‌রেট— মরিস মেটারলিংক।

(লেখক ও সংকলক : সলিল গেঁউলি।
সম্পাদনা : ড. এ ভি মুরলী,
নাসার প্রাক্তন বৈজ্ঞানিক।)

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

পরিবার পরিজনদের সুস্থ রাখতে ভেজাল নিজেরাই পরীক্ষা করুন

অঙ্গনা

সুতপা বসাক ভড়

সংসার চালানো মুখের কথা নয়। বাড়িতে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই মহিলাদের কর্মক্ষেত্রের মধ্যে পড়ে। তা সত্ত্বেও দায়িত্বশীল গৃহিণীদের মনের মধ্যে কিছু সংশয় থেকেই যায়। চারদিকের যা পরিস্থিতি, তাতে তাঁরা তাঁদের পরিবার পরিজনদের যা খাদ্য



পরিবেশন করেন, তা কি সত্যিই খাদ্যের পর্যায়ভুক্ত? নাকি, না জেনে খাদ্যের নামে অখাদ্য কিছু তুলে দিতে বাধ্য হচ্ছেন? বর্তমানে ভেজালে চারদিক ছেয়ে গেছে। কেবলমাত্র আর্থিক লাভের আশায় অসাধু ব্যবসায়ীরা মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে চলেছে। তাদের কাছে সততার কোনো দামই নেই। অথচ সাধারণ মানুষের কী দোষ? তাঁরা তো শুদ্ধ ভেজালহীন জিনিস কিনতেই বাজারে যান। এক্ষেত্রে কয়েকটি অতি সরল পদ্ধতির সাহায্যে গৃহিণীরা কিছু নিত্য ব্যবহার্য খাদ্যসামগ্রীতে ভেজাল আছে কিনা, তা নিজেরাই পরখ করে নিতে পারেন।

দুধ, সবজি, মশলা কিছুই প্রায় শুদ্ধ পাওয়া যায় না। যেমন, কিছু সন্দেশ বা মিষ্টিতে রুপোর তবক দেওয়া থাকে। ফুড সেফ্‌টি অফিসাররা (এফএসও) দেখেছেন যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রুপোর তবকের জায়গায় অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলের ব্যবহার বাজারে চলছে। এক্ষেত্রে মিষ্টির ওপর দিকে হাতের আঙুল দিয়ে অল্প চাপ দিলে যদি রুপোলি পরতটি হাতে উঠে আসে, তাহলে সেটি রুপোর তবক নয়, অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল— যা পেটের সংক্রমণ এবং পেট খারাপ করার জন্য দায়ী।

চায়ের পাতায় ভেজাল আছে কিনা জানার জন্য এক চামচ চা-পাতা ঠাণ্ডা জলে মেশালে যদি জলের রঙ খয়েরি হয়ে যায় তা হলে নিশ্চিত হয়ে যান, ওই চায়ে ভেজাল রয়েছে।

দুধে ডিটারজেন্ট আছে কিনা জানার জন্য সমান পরিমাণ জল এবং দুধ মেশান। ফেনা তৈরি হলে জানবেন ওতে ডিটারজেন্ট আছে। সিন্থেটিক দুধ ফোটানোর পর হলুদ রঙের ফেনা হয়। এছাড়া দুধে খানিকটা পাতিলেবুর রস দিয়ে নাড়ুন, যদি ছানা না কাটে, তবে জানবেন দুধে ভেজাল আছে।

এক চামচ চিনি একগ্লাস জলে গুলুন। জলের রঙ ঘোলাটে হলে চিনিতে চক গুঁড়োর ভেজাল আছে। মধু শুদ্ধ কিনা জানার জন্য তুলোর সলতে বানিয়ে মধুতে ডুবিয়ে আগুন জ্বালান। যদি সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে, তাহলে মধু শুদ্ধ, আর যদি পটপট করে তাহলে জানবেন ওটি ভেজাল মধু।

বাজারে ঠাণ্ডা কড়াইশুঁটির প্যাকেট বিক্রি হয়, যা ব্যবহারের পক্ষে খুবই সুবিধাজনক। ভেজাল আছে কিনা জানার জন্য ব্যবহারের আগে কিছু কড়াইশুঁটি জলে ফেলে নাড়ুন, জলের রঙ সবুজ হলে জানবেন ওই কড়াইশুঁটি খাবার অযোগ্য। ওই প্যাকটে এমন সবুজ রঙ ব্যবহার করা হয়েছে যা পেটে গেলে পেটের গণ্ডগোল হতে বাধ্য।

দারুচিনির কাঠিগুলি হাতে নিয়ে গুঁড়ো করলে যদি হাতে দারুচিনির রঙ লেগে যায়, তবে সেটি শুদ্ধ। এমনকী গোলমরিচ যদি খুব চকচক করে এবং শুঁকলে কেরোসিনের গন্ধ বেরোয়, বুঝবেন ভেজাল।

আমাদের রান্নাঘরে জিরের ব্যাপক ব্যবহার হয়ে থাকে। জিরেতে ভেজাল আছে কিনা জানতে হলে কিছু জিরে নিয়ে হাতে ঘষতে থাকুন, যদি হাতের তালু কালো হয়ে যায়, জানবেন ওতে কয়লা গুঁড়ো মেশানো আছে।

অনেক সময় ধনে গুঁড়োতে ভুসি মেশানো থাকে। নিশ্চিত হবার জন্য কিছু ধনে গুঁড়ো জলে মেশান, ওতে ভুসি মেশানো থাকলে, তা জলের ওপর ভেসে উঠবে। হলুদ গুঁড়ো ঠাণ্ডা জলে মিশিয়ে খানিকক্ষণ রাখলে যদি জলের রঙ হলুদ হয়ে যায়, তবে হলুদে ভেজাল আছে বুঝতে হবে। সেই রকম লঙ্কাগুঁড়ো একগ্লাস জলে মেশান, যদি জলের রঙ টকটকে লাল হয়ে যায়, তাহলে জানবেন লঙ্কাগুঁড়োতে ভেজাল রয়েছে।

লাল চকচকে আপেল দেখলেই খেতে ইচ্ছে হয়; অথচ আপেলের ওই চেহারা অনেক সময় মোম ঘষে চকচকে করা হয়। আপনার আপেলের খোসায় মোম আছে কিনা জানার জন্য একটা ছুরি দিয়ে আস্তে আস্তে খোলার ওপর ঘষুন, সাদা সাদা কিছু বেরোলে জানবেন সেটি আপেলের খোসার ওপর মোমের আস্তরণ। এভাবে আমরা মহিলারা অতি সহজেই বাজার থেকে কেনা সন্দেহজনক খাদ্যবস্তুগুলি নিজেরাই পরীক্ষা করে নিতে পারি। এর ফলে সামান্য হলেও মনের মধ্যে তৃপ্তিবোধ থাকবে যে আমরা আমাদের সাধ্যমতো ভেজালমুক্ত খাবার পরিবারের সদস্যদের পরিবেশন করতে পারছি। এইটুকুই শান্তি। ▮

যাদের না হলে চলে না

কৃষ্ণেন্দু ব্যানার্জী

পুরনো আমলের বাড়ি। বাড়ির ভেতরে বড় উঠোন। বড় বড় থাম। খড়খড়ি দেওয়া জানালা। বাড়ি ভর্তি লোকজন। বড় পরিবার। এই পরিবারের লোকজনের সঙ্গে আরও এমন দু'একজন থাকতেন যাদের পরিবারের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করা হোত; তারা হলো গৃহ পরিচারক এবং গৃহ-পরিচারিকা। এখন বলা হয় গৃহ-সহায়ক বা গৃহ-সহায়িকা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার কাহিনিতে এই শ্রেণীর সরস উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি ছেলেবেলায় এদের হাতেই মানুষ হয়েছিলেন। এদের ক্রিয়া-কলাপকে 'ভৃত্যরাজতন্ত্র' বলে উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'পুরাতন ভৃত্য'-র পঙ্‌ক্তিগুলি স্মরণীয়—

'ভূতের মতন চেহারা যেমন, নির্বোধ অতি ঘোর,
যা কিছু হারায় গিন্নী বলেন, কেষ্টা বেটাই চোর।
উঠিতে বসিতে করি বাপান্ত, শুনেও শোনে না কানে,
যত পায় বেত না পায় বেতন কভু না চেতন মানে।'

এই কবিতাটিতে তৎকালীন সমাজের 'ভৃত্য'দের অবস্থান এবং তাদের অবস্থার বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়। বর্তমান আধুনিক যুগেও গৃহ-পরিচারকগণের অবস্থার কি তেমন পরিবর্তন হয়েছে? আগেকার কালে তাদের সঙ্গে ব্যবহারের সামঞ্জস্য অনুযায়ী ঝি, চাকর, ভৃত্য, দাস, দাসী প্রভৃতি বিশেষণ ব্যবহার হোত। বর্তমান আধুনিক যুগে শিক্ষাদীক্ষা এবং রুচি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ওই শ্রেণীর প্রতি সম্বোধনের সংজ্ঞাও পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। অনেকে আজকাল 'কাজের মাসি' ইত্যাদি বলে থাকেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রকৃত অবস্থার কতটা পরিবর্তন হয়েছে? সাংবাদিক তৃপ্তি লাহিড়ি তাঁর সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ, যা গৃহপরিচারিকা এবং গৃহ-পরিচারকদের বিষয় লেখা হয়েছে। বইটির নাম 'Maid in India' গ্রন্থটির প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'There is a worring tendency in cities to take out frustrations on house help.' সংবাদপত্রের পাতায় এখনো মাঝে মধ্যে প্রকাশিত হয় গৃহ-পরিচারক/পরিচারিকাগণের উপর নির্যাতনের নানা খবর।

যেসব কাজ গৃহস্থরা করতে চায় না, সেইসব কাজ তারা করে, অথচ তাদের অসম্মান এবং অবজ্ঞার চোখে দেখা হয়। বাড়ির কোনো জিনিসপত্র খোয়া গেলে বা চুরি হলে সর্বপ্রথম সন্দেহ তাদের উপর গিয়ে পড়ে। তাদের জীবনযাত্রার মানও আশানুরূপ নয়, আর্থিকভাবে পশ্চাদপদ শ্রেণীভুক্ত বলা যায় তাদের।

কয়েক শতাব্দী আগেকার কথা। যখন রাজা-বাদশা এবং জমিদারবাবুদের রমরমা ছিল। তখন অজস্র গৃহ-পরিচারক নিয়োগ করা বাবুবিলাসের একটা অঙ্গ ছিল। পান সাজার জন্য পাঁচ-ছ'জন লোক বহাল করা হোত। প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের লেখা গল্প-উপন্যাসে এই চরিত্রের বিস্তারিত বর্ণনা দেখা যায়। শুধুমাত্র বাড়ির কাজের লোককে কেন্দ্রীয় চরিত্র করে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন জনপ্রিয় চিত্রপরিচালক তপন সিংহ। চলচ্চিত্রটির নাম 'গল্প হলেও সত্যি'। চলচ্চিত্রটিতে বাড়ির পরিচারকের ভূমিকায় রবি ঘোষের অনবদ্য অভিনয় আজও চলচ্চিত্রপ্রেমীদের স্মৃতিকোঠায় অম্লান হয়ে আছে। বর্তমানে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের জোয়ার শহর ও শহরতলির মধ্যবিত্ত বাঙালির অনেক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। এখন আগেকার মতো বড় বড় থাম ও দরজা-জানালাসমৃদ্ধ বৃহদায়তন অট্টালিকা



দেখা যায় না। পরিবর্তে বহুতল বাড়ি তৈরি হচ্ছে চলতি কথায় যাকে বলে 'ফ্ল্যাট'। এই ফ্ল্যাট-সংস্কৃতি বাঙালি আস্তে আস্তে রপ্ত করে নিচ্ছে। সেখানে ছোট ছোট দু'কামরার ঘর, যেখানে স্বামী-স্ত্রী আর ছোট ছেলেমেয়ে। সেখানে বাবা-মা, দাদু-ঠাকুমা, কাকা-কাকি, জ্যাঠা-জেঠি, ভাই-বোনেদের কোনো স্থান নেই। এদিকে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের ফলে গৃহ-পরিচালক-পরিচারিকাদের জোগানেও এখন ভাঁটার টান পড়েছে। কলকাতা এবং কলকাতার উপকণ্ঠে বসবাসকারী মানুষজনের সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে অনেকেই বলে থাকেন, 'একটা কাজের লোক জোগাড় করে দাও না ভাই, আর পারছি না।' তাই এখন একটা নতুন ধরনের সংস্থার জন্ম হচ্ছে নাম 'আয়া সেন্টার'। তারাই এখন লোকের প্রয়োজন মতো 'কাজের লোক' সরবরাহ করে। তবে এদের সঙ্গে গৃহকর্তা বা কর্ত্রীর সম্পর্ক অনেকটাই অফিসিয়াল। এখানে আবেগের স্থান বড় একটা নজরে পড়ে না।

অনেকদিন আগেকার কথা। আমি তখন খুব ছোট। একদিন সন্ধ্যাবেলা প্রায় বৃদ্ধ গোছের একজন অবাঙালি আমাদের বাড়িতে এলেন। তাকে দেখে বাড়ির লোকজন হইহই করে উঠল। 'আরে সফি এসেছিস! আয়! আয়! ভেতরে আয়!!' এই সফি অনেক কাল আগে আমাদের বাড়িতে গৃহ-পরিচারকের কাজে নিযুক্ত ছিল। পরে কোনো কাজ পেয়ে অন্যত্র চলে যায়। তা সেই সফির সঙ্গে বাড়ির লোকজন পুরনো গল্পে মেতে উঠল। তারপর তাকে জলখাবার দেওয়া হলো। জলযোগ করে একটু রাত্রিবেলায় সে বিদায় গ্রহণ করল।

সেই সময় বাবা অফিস থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। রাস্তায় সফির সঙ্গে দেখা। বাবা তাকে বাড়িতে ধরে নিয়ে এলেন। বাবা হাত-মুখ ধুয়ে চা খেতে খেতে তার সঙ্গে নানান গল্পে মেতে উঠলেন। অবশ্যই গল্পের বিষয়বস্তু পুরনো দিনের কথা। এরপর বাবা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন সে এখন কোথায় আছে কী করছে ইত্যাদি। কিছুক্ষণ পর সফি আস্তে আস্তে উঠে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। তারপর আর কোনোদিন তাকে আমাদের বাড়ি আসতে দেখিনি। এই ধরনের সম্পর্ক আজ বিরলতম বললেও অত্যুক্তি হয় না। সময়ের স্রোতের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অনেক কিছুই বদলায়। তাই স্বাভাবিকভাবেই বদলে গিয়েছে গৃহপরিচারক ও নিয়োগকর্তার আবেগময় সম্পর্ক।

একটা হৃদয়স্পর্শী ঘটনার কথা বলে প্রসঙ্গ সমাপ্ত করছি। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম হয়তো অনেকেই শুনেছেন। উনি তখন সদ্যোজাত শিশু, সেই সময় তাঁর গর্ভধারিণী মাতা শারীরিক কোনো কারণবশত তাঁকে স্তন্যদান করাতে অক্ষম ছিলেন। বাড়ির একজন গৃহপরিচারিকা মহিলা তাঁকে স্তন্যপান করিয়ে সুস্থ রেখেছিলেন। কালান্তরে ওই পরিচারিকা বৃদ্ধা হলে কাজ থেকে অব্যাহতি নিয়ে দেশে ফিরে যান। এর অনেককাল পর ওই বৃদ্ধা মহিলা মকরসংক্রান্তি উপলক্ষে সঙ্গীসাথী নিয়ে কলকাতার বাবুঘাটে গঙ্গাস্নান করতে এসেছেন। তখন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা ন্যায়ালয়ের বিচারপতি পদ অলঙ্কৃত করছেন।

কীভাবে কথাটি বৃদ্ধার কানে পৌঁছেছিল। তিনি ন্যায়ালয়ের প্রধান দরজার সামনে এসে গুরুদাস! গুরুদাস! বলে চিৎকার করতে করতে ভিতরে প্রবেশ করতে উদ্যত হন। যথারীতি পেয়াদা এসে বাধা দেয়। হৈচৈ হট্টগোল শুরু হয়ে যায়। বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং কৌতূহলী হয়ে ব্যাপারটি দেখতে আসেন। দেখেন সেই মহিলা যিনি তাঁকে স্তন্যপান করিয়েছিলেন এবং পালন করেছিলেন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পেয়াদাদের বললেন ওঁকে ছেড়ে দিতে এবং উনি বৃদ্ধার সামনে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। তারপর উপস্থিত সবার সঙ্গে ওঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন। এই সময় ওঁর এজলাসে একটি মামলার শুনানি চলছিল। সেই মামলার শুনানি স্থগিত করে দিয়ে ওই বৃদ্ধাকে সস্নেহে জড়িয়ে ধরে ঘোড়ার গাড়িতে করে বাড়ি নিয়ে গেলেন। ■



অগতির গতি আয়া সেন্টার

দশ বছর আগেও ছবিটা এরকম ছিল না। তখন বাড়ির অসুস্থ মানুষটির সেবা আপনজনেরাই করতেন। কিন্তু ঘরে-বাইরে কর্মব্যস্ততা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছবিটা পালটে গেল। এখন বৃদ্ধ বাবা-মা'র সেবার দায়িত্ব থাকে আয়াদের ওপর। বারো ঘণ্টার ডিউটিতে রোগীকে স্নান করানো খাওয়ানো মলমূত্র ত্যাগ করানো থেকে শুরু করে সব কাজই করতে হয়। এর সঙ্গে রয়েছে রোগীর সঙ্গে কথা বলা, প্রয়োজনে তাঁকে কাছেপিঠে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া অর্থাৎ রোগীর মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখা। স্বাভাবিকভাবেই আয়াদের ওপর মানুষের নির্ভরতা বাড়ছে। কলকাতার ইতিউতি চোখে পড়ে অসংখ্য আয়া সেন্টার। মজার ব্যাপার হলো, আয়াদের কাজ আর রোগীর সেবায় আটকে নেই। ঠিকে কাজের লোক, রান্নার লোক, বেবিসিটার— এক কথায় বাড়িতে যাদের না হলে চলে না তাদের সকলেরই সুলুকসন্ধান দেয় আয়া সেন্টার। কলকাতা-সহ, বলতে গেলে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গেই চাকুরে ছেলেমেয়েরা বিয়ে করার পরেই ফ্ল্যাট কেনেন। তারপরেই খোঁজ পড়ে আয়া সেন্টারের। লক্ষ্মীকান্তপুর লাইন থেকে হাজার হাজার মহিলা এইসব আয়া সেন্টারে নাম লেখান। কাজের সুযোগ এতই বেশি যে বাংলাদেশের মহিলারাও বৈধ অবৈধ নানা উপায়ে সীমান্ত পেরিয়ে চলে আসেন আয়ার কাজ করতে। হামিদা বানুর নাম হয়ে যায় টুম্পা। যাদবপুরের যে বাড়িতে কাজ তারা বুঝতেও পারেন না এইমাত্র যে কিশোরী মেয়েটি পোস্তর বড়া ভেজে দিয়ে গেল সে আসলে এসেছিল সাতক্ষীরা থেকে।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না। টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫, হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429, IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name : United Bank of India, Branch : Bidhan Sarani

কিডনি ভালো রাখার টিপস্

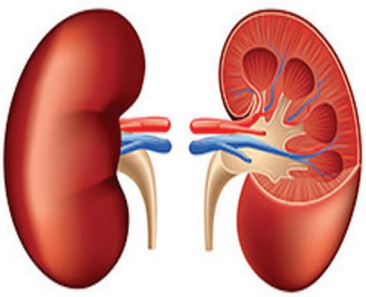

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

মানবদেহের রেচনতন্ত্র গঠিত একজোড়া বৃক্ক বা কিডনি, একজোড়া গবিনী একটি মূত্রাশয় এবং একটি মূত্র থলি নিয়ে। বিপাক ক্রিয়ার ফলে দেহকোশে নানা দূষিত রেচন পদার্থের সৃষ্টি হয়। এই রেচন পদার্থসমূহ যে ধারাবাহিকতার সাহায্যে দেহ থেকে বহিষ্কৃত হয়, তাই চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক্সক্রিশন নামে পরিচিত। মূত্রত্যাগ মানবদেহের প্রধান রেচন কৌশল। উল্লেখ্য যে, ফুসফুস জলীয় বাষ্প এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগের মাধ্যমে এবং চামড়া ঘাম নিঃসরণের মাধ্যমে দেহ থেকে রেচন পদার্থ ত্যাগে যথার্থ সহায়তা করায়, ফুসফুস এবং চামড়াকে বলা হয় সহায়কারী রেচন অঙ্গ। তবে কিডনি বা বৃক্কই হলো মানবদেহের প্রধান রেচন যন্ত্র।

শিমের বিচির মতো কালচে বাদামি বর্ণের বৃক্ক ওজনে প্রায় একশো পঁচিশ থেকে সত্তর গ্রাম হয়। বৃক্ক দুটি মানবদেহের উদর গহ্বরের কটি অঞ্চলে মেরুদণ্ডের উভয় পাশে পেরিটোনিয়ামের নীচে, পৃষ্ঠ প্রাচীর সংলগ্ন অবস্থায় অবস্থিত। বৃক্কের লম্বচ্ছেদ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পর্যবেক্ষণ করলে তার মধ্যে অসংখ্য সূক্ষ্ম চুলের ন্যায় কুণ্ডলীকৃত নালিকা দেখতে পাওয়া যায়। এগুলিকে নেফ্রন বলে। আসলে নেফ্রন হলো বৃক্কের গঠনমূলক এবং কার্যমূলক একক। বৃক্কের নেফ্রনের মধ্যেই মূত্র উৎপন্ন হয়। এক একটি বৃক্ক প্রায় দশ লক্ষ নেফ্রনের সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিটি নেফ্রনের গড় দৈর্ঘ্য প্রায় পাঁচ সেন্টিমিটার। দুটি বৃক্কের সব নেফ্রন (২০ লক্ষ) পর পর যোগ করলে প্রায় চল্লিশ মাইল লম্বা হবে। কিডনি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবেও কাজ করে এবং রেচন ও ইরিফ্রোপায়েটিক ফ্যাক্টর ক্ষরণ করে। দেহের অম্লক্ষারের সাম্যাবস্থা বজায় রাখার ক্ষেত্রেও এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। রক্তে শর্করার পরিমাণ ১৮০ মিলিগ্রাম (একশো মিমি রক্তে) কিংবা এর ঊর্ধ্বে হলে বৃক্ক রক্তের অতিরিক্ত শর্করাকে মূত্রের সঙ্গে নির্গত করে রক্তে শর্করার পরিমাণ স্বাভাবিক হতে সাহায্য করে।

অবশ্য বৃক্কের অন্তর্গত নেফ্রনে রক্তের প্রয়োজনীয় পদার্থগুলি পুনঃশোষণ ঘটিয়ে রক্তের উপাদানের সমতা বজায় রাখে, রেচন তন্ত্রের অন্তর্গত বৃক্ক দেহের ভিটামিন-ডি কিংবা ক্যালসিফেরল বিপাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

কিডনি ভালো রাখতে চিনি খাওয়া কমাতে হবে। কারণ ক্যালোরি জোগানো ছাড়া চিনির আর কোনো গুণ নেই। অতিরিক্ত খেলে শরীরে ইউরিক অ্যাসিড তৈরির হার বেড়ে যেতে পারে। পরে এই ইউরিক অ্যাসিডের হাত ধরে কিডনি ও হৃদরোগের সমস্যা হতে পারে। সফট ড্রিঙ্ক যাঁরা নেন তাদের প্রোটিন, ইউরিয়া নামে ইউরিনের সঙ্গে প্রোটিন বেরোনোর সমস্যা হতে পারে। কিডনির খারাপ হওয়ার বেশ বড়ো মাপের লক্ষণ এটি। জলও যদি প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খাওয়া যায় তা প্রাণঘাতী হতে পারে। কিডনি খারাপ হতে পারে কৃত্রিম রঙের রাঙানো খাবার, জাঙ্কফুড, হাইপ্রোটিন ডায়েট নিয়মিত খেলে, অতিরিক্ত রেডমিট খেলে কিডনি ফেলিওরের চান্স তিন গুণ বেড়ে যায়। প্রচুর নুন খেলেও সমস্যা আছে।

খাবারের মোট ক্যালিরির ৬০-৬৫ শতাংশ যেন কার্বোহাইড্রেট থেকে আসে। দিনে একবাটি ভাত, গোটা চারেক রুটি, চিড়ে, মুড়ি, খই এবং দু-তিন রকম শাক সবজি ও ফল খান। বয়স ৪০-এর ধারে কাছে ওজনের ১০ শতাংশ বেশি প্রোটিন খাবেন না। অর্থাৎ ওজন ৬০ কেজি হলে দিনে ৬০ গ্রাম প্রোটিন।

মাছ, মাংস, ডালের ১০০ গ্রামে মোটামুটি ২০ গ্রাম প্রোটিন থাকে। ৫০ গ্রাম ওজনের ডিমে থাকে ৬-৬৫ গ্রাম। ১০০ মিলি দই বা দুধে ৪ গ্রাম অর্থাৎ সকালে একটা ডিম/দুধ/দই/ছানা/চিজ খেতে পারেন, দুপুরে ৫০ গ্রামের দু-পিস মাছ বা মাংস আর ডাল, পনির বা দই খেলে খান। রাতেও একই নিয়ম।

সকালে ছোলা বা মুগ ভেজানো অল্প খেতে পারেন। বিকেলেও অল্প বাদাম চলতে পারে। খেয়াল রাখবেন সসেজ, বেকন, রাজমা, সয়াবিন, সবই কিন্তু প্রোটিন। একটা খেলে আরেকটা কমিয়ে ব্যালান্স রাখবেন। স্বাভাবিক খাবার খেলে মোটামুটি ৭ গ্রাম নুন আমাদের খাওয়ার কথা, সেক্ষেত্রে যদি ৫ গ্রাম খান তাহলে আপনার কিডনি ২০ শতাংশ সুরক্ষিত থাকবে। কিডনি ভালো রাখতে পরিমাণ মতো জল খান। কী ধরণের কাজ করেন তার ওপর নির্ভর করে দিনে আড়াই তিন লিটার থেকে ম্যাক্সিমাম ৪ লিটার। এর থেকে কম খেলে কিডনি স্টোনের প্রবণতা বাড়বে। বেশি খেলে অতিরিক্ত খাটুনিতে কিডনির ক্ষতি হবে।

কিডনি ভালো রাখতে গেলে একেবারে শুয়ে বসে থাকা যেমন চলবে না। তেমনি অতিরিক্ত জিম করলেও বিপদ। দিনে ৩০-৪০ মিনিট কার্ডিও এক্সারসাইজ যেমন রিক্স ওয়ার্কিং, সাঁতার, সাইক্লিং ইত্যাদি যথেষ্ট সঙ্গে ২০ মিনিট যোগাসন। ননস্টেরয়ডাল অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি গ্রুপের ব্যাপার ওষুধ নিয়মিত খেলে সমস্যা হতে পারে। প্যারাসিটামল সাধারণ ভাবে ভালো। তবে নিয়মিত খাবেন না। এরকম অসংখ্য ওষুধ আছে যা ডাক্তারি তত্ত্বাবধান ছাড়া খেলে সমস্যা হতে পারে। ■

অন্য রকম

দিনমজুর থেকে সিলিকন ভ্যালির কর্ণধার

অনিলজ্যোতি রেড্ডি



নিজস্ব প্রতিনিধি॥ 'আমি মেয়েদের জন্য কাজ করতে চাই। ভারতের গ্রামেগঞ্জে ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সী যেসব মহিলা বসবাস করেন, আমার লক্ষ্য তাদের শক্তিশালী করে তোলা। জীবনে অর্থ যথেষ্ট রোজগার করেছি। এবার দেশের জন্য কিছু করতে চাই।' কথাগুলো অনিলজ্যোতি রেড্ডির। পেশায় সফটওয়্যার বিশেষজ্ঞ। বর্তমানে আমেরিকার কি সফটওয়্যার সলিউশনের সিইও।

অনিলজ্যোতির জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জনের কাহিনির সঙ্গে একমাত্র রূপকথার ফিনিক্স পাখির তুলনা চলে। জীবন শুরু করেছিলেন অন্ধ্র প্রদেশের ওয়ারাঙ্গাল জেলায় দিনমজুর হিসেবে। মজুরি পেতেন দিনে পাঁচ টাকা। তারপর শুধু লড়াই আর লড়াই। জীবনসংগ্রামে যারা জয়ী হন তাঁরা আগে চ্যালেঞ্জকে মইয়ের মতো ব্যবহার করার টেকনিক আয়ত্ত করেন। অনিলজ্যোতিও তার ব্যতিক্রম নন। সেই কারণেই আজ তিনি আমেরিকার অন্যতম প্রধান একটি সফটওয়্যার কোম্পানির কর্ণধার। নিঃসন্দেহে প্রেরণা দেওয়ার মতো সাফল্য। কিন্তু অনিলজ্যোতি প্রশংসা শুনতে নারাজ। তিনি বলেন, 'জীবন সব কিছু শিখিয়ে দেয়। কিছুক্ষণ পর আরও বিনীত ভঙ্গীতে উচ্চারণ করেন, 'এখনও অনেক কিছু করা বাকি।'

অনিলজ্যোতির আর একটি স্বপ্ন অনাথ শিশুদের জন্য স্কুল তৈরি করা। এই স্বপ্নটি তার ছেলেবেলার অজস্র যন্ত্রণাময় মুহূর্তের প্রকাশ। তাঁর জন্ম হতদরিদ্র একটি পরিবারে। পাঁচটি সন্তানের পর আবার একটি মেয়ে! বাবা-মা বাধ্য হয়ে বাচ্চা মেয়েটিকে একটি অনাথ আশ্রমে রেখে এসেছিলেন। বাড়ির জন্য তার মন কেমন করত। দশ বছর বয়সে অনিলজ্যোতি একবার মায়ের কাছে যাবেন বলে খুব বায়না ধরেছিলেন। কিন্তু আশ্রম-কর্তৃপক্ষ গুরুত্ব দেয়নি। কারণ সরকারিভাবে অনিলজ্যোতি অনাথ। তার বাবা-মা থাকতেই পারে না।

পাঁচ টাকা পারিশ্রমিকে দিনমজুরের কাজ করলেও অনিলজ্যোতি সুযোগের অপেক্ষায় থাকতেন। আশ্রমে একটি স্কুল ছিল। সেখানে আশ্রম-কর্তৃপক্ষের উদ্যোগেই অনিলজ্যোতি পড়াশোনা করছিলেন। অবশেষে একদিন সুযোগ এল। তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের একটি প্রকল্প নেহরু যুবকেন্দ্রের স্বেচ্ছাসেবক হয়ে গেলেন। কাজ ছিল অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের নানা বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো এবং স্কুলে পড়ানো। তবে মাইনে পেতেন সামান্য। ওই টাকায় চলে না। তাই বাড়তি রোজগারের জন্য শুরু করলেন মেয়েদের পোশাক তৈরির কাজ। এই সময়েই (১৯৯৪ সাল) তিনি ড. বি. আর. আম্বেদকর ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে বিএ পাশ করেন। এরপর ১৯৯৭ সালে কাকতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ। দুটি ডিগ্রির সাহায্যে অনিলজ্যোতি অন্য একটি স্কুলে এবার সামান্য বেশি মাইনের একটি চাকরি পেলেন। তবে স্কুলে যেতে দু'ঘণ্টা সময় লাগত। এই সময়ে অনিলজ্যোতি সহযাত্রিণীদের কাছে নিজের তৈরি শাড়ি বিক্রি করতেন। ইতিমধ্যে তাঁর বিয়ে হয়েছে। দুটি কন্যাসন্তানের মা হয়েছেন।

অনিলজ্যোতির আমেরিকা যাওয়া বেশ অদ্ভুতভাবে হয়েছিল। আমেরিকা প্রবাসী এক আত্মীয় প্রথমে প্রস্তাবটা দেন। কিন্তু যাওয়া কি অতই সহজ? অনিলজ্যোতি বলেন, 'সত্যিই সহজ ছিল না। একদিকে টাকার অভাব, অন্যদিকে ভিসা পাওয়া নিয়ে সমস্যা। তাছাড়া মেয়েদের কীভাবে ফেলে রেখে যাব সেই চিন্তাও আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল।' আমেরিকায় পৌঁছে গভীরতর সঙ্কটে পড়লেন অনিলজ্যোতি। কোনো আত্মীয়ের কাছে সাহায্য পাওয়া গেল না। পেয়িং গেস্ট হিসেবে আশ্রয় পেলেন একটি গুজরাটি পরিবারে। সেই সময় জীবনধারণের জন্য অনেক কিছু করতে হয়েছে। শেষে দক্ষিণ ক্যারলিনায় একটি সফটওয়্যার সংস্থায় রিক্রুটারের চাকরি পেলেন। কিন্তু কপাল মন্দ! অনিলজ্যোতি বলেন, 'ওখানে কিছুদিন কাজ করার পর পদত্যাগ করতে বাধ্য হলাম। কারণ আমার কাছে ওয়ার্কিং ভিসা ছিল না। এইচ ওয়ান ভিসা পাওয়া পর্যন্ত আমাকে কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছে। এই সময়েই ঠিক করেছিলাম নিজের সংস্থা করব। চল্লিশ হাজার ডলার জমাতে পেরেছিলাম। তাই দিয়েই শুরু করলাম।'

বলতে বলতে চিকচিক করে উঠল অনিলজ্যোতির চোখ। সংগ্রামের কথা শেষ করেই শুরু করলেন স্বপ্নের কথা। দেশের জন্য কিছু করার কথা। বুঝিয়ে দিলেন তিনি থামতে রাজি নন। ■



সংস্কার ভারতীর শিশু কিশোর নাট্যমেলা

বিকাশ ভট্টাচার্য॥ আমাদের অ্যাকাডেমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্য বিষয়ে খুদে পড়ুয়াদের সচেতন করে তোলার বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। পাঠ্যপুস্তকের ভারে নুয়ে পড়া ছেলেমেয়েরা অন্য কোনো দিকে তাকাবার ফুরসতই পায় না। স্বভাবতই সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি রুচিবোধও গড়ে ওঠে না। অথচ, এই বেড়ে ওঠার সময়ে এসব ব্যাপারে আগ্রহ বা রুচিবোধ গড়ে না উঠলে পরবর্তী সময়ে আর হয়ে ওঠে না।

অখিল ভারতীয় সাংস্কৃতিক সংগঠন সংস্কার ভারতীর দক্ষিণবঙ্গ শাখা এই শিশু কিশোরদের নাচ গান আঁকাজোকা আর নাটকে অভিনয় বিষয়ে আগ্রহী। প্রতি বছর গরমের ছুটি ও পুজোর ছুটিতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পাঁচ থেকে পনেরো বছরের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে কর্মশালা ভিত্তিক কয়েকটি নাট্য প্রযোজনা করে থাকে। সংস্থার পক্ষ থেকে শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায় জানান, এর সূচনা হয়েছিল ২০০৮ সালের জাতীয় শিশুদিবসে। প্রতি বছর সংস্কার ভারতীর একটি নাটক ছাড়াও আরও চারটি প্রযোজনা অন্য বিদ্যালয় বা শিশু প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে করা হয়।

এ বছর গত ৫ জুন গিরিশ মঞ্চে সংস্কার ভারতীর শিশু-কিশোর নাট্যমেলার উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট অভিনেত্রী ও স্কুল শিক্ষিকা শ্রীমতী সোহিনী সেনগুপ্ত। সোহিনী খুব ছোট থেকেই নাটকের আবহাওয়ায় বড় হয়েছেন। নিজে ছোটদের নিয়ে কাজ করতে উৎসাহী। নান্দীকার তার কর্মভূমি। তিনি বলেন, ছোটদের নিজের মতো কাটানোর জন্য কিছুটা সময় ছেড়ে দেওয়া উচিত। সব সময় বাবা-মার ইচ্ছেটাই তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। এতে হিতে বিপরীত হতে পারে।

এদিন সন্ধ্যায় প্রথম নাটক ছিল বাগমারী-মুরারীপুকুর অঞ্চলের প্রি-প্রাইমারি স্কুল দি হোলি অ্যাকাডেমির ‘বীরেশ্বর বিবেকানন্দ’। স্বামীজীর ছোটবেলার বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে নাটকটি গড়ে উঠেছে। প্রি-রেকর্ডেড সংলাপের সঙ্গে চার-পাঁচ বছরের খুদে শিল্পীরা চমৎকার ঠোঁট মিলিয়েছে। পরিচালনায় কোজাগরী দাস। নাট্যরূপ ও সংলাপ লিখেছেন চিরঞ্জিৎ ভদ্র। দ্বিতীয়টি ছিল নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের হাসির নাটক ‘ভাড়াটে চাই’। বাগুইহাটির সান্তপনের কিশোর শিল্পীরা স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয়ে নাটকটি জমিয়ে দেয়। পরিচালনায় ছিলেন সান্ত্বনা চট্টোপাধ্যায় ও প্রদীপ দাস।

এরপর একটু স্বাদ বদল। দক্ষিণেশ্বরের নন্দন কাননের কিশোর কিশোরীদের আবৃত্তি-গান ও ভাষ্যের এক অনবদ্য কোলাজ ‘শিখাময়ী নিবেদিতা’। সমবেত কণ্ঠে প্রায় ষোলজন শিল্পী অনায়াস দক্ষতায় আবৃত্তি থেকে গান, গান থেকে ভাষ্য নিবেদন করেন। শুধু গলায় কোনও যন্ত্র ছাড়া গানে কোথায় এতটুকু সুর বিচ্যুতি ঘটেনি। যা প্রশংসনীয়। পরিচালনায় প্রবীর ভট্টাচার্য। সুদূর গোরবডাঙ্গার রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার ছোটরা নিবেদন করে ‘দুর্গা বিভ্রাট’— একটি হাসির নাটক। শারদীয়া উৎসবে কৈলাশ থেকে মর্ত্যে এসেছেন মা তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে। সঙ্গে অসুর। মর্ত্যে এসে বিভিন্ন ঘটনায় কী হলো— তাই নাটকের উপজীব্য। ছোটরা অভিনয় ভালোই করেছে। নাটক ও নির্দেশনায় ছিলেন বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য।

প্রেক্ষাগৃহ মোটামুটি ভর্তিই ছিল। ছোট ছোট দর্শকদের স্বতঃস্ফূর্ত হাস্যরোলে বোঝা যায় অনুষ্ঠান উপভোগ্য হয়েছিল। নাট্যমেলায় বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব নান্দীপটের প্রকাশ ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন।

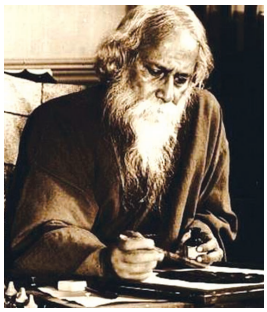

রবীন্দ্রনাথের চিঠি

শান্তিনিকেতন থেকে ত্রিপুরার রাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোরকে একটি চিঠি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এবার নবাঙ্কুরের পাতায় সেই চিঠি।

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

কল্যাণীয়েষু,

যে অবস্থায়, যে সঙ্গে, যে শিক্ষার মধ্যে পতিত হও না কেন, ভারতবর্ষের আদর্শকে কোনোমতেই হৃদয় হইতে ম্লান হইতে দিয়ো না। ইহা নিশ্চয় মনে রাখিও ইউরোপীয় বর্বরেরা ভারতবর্ষের যথার্থ মহত্ত্ব না বুঝিতে পারিয়া উপহাস করে। সে উপহাসকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিও। তোমার শিক্ষক যদি ভারতবর্ষকে নিন্দা করে, তুমি সে নিন্দাকে নিরুত্তরে অবজ্ঞা করিও। আমার বিদ্যালয়ে তোমার হয়তো না আসাই ভালো। কারণ আমি নিভৃতে লোকের আলোচনার বাহিরে আমার কাজ করিতে চাই। তুমি এখানে আসিলে অজস্র কথার সৃষ্টি হইয়া হট্টগোলের মধ্যে পড়িতে হইবে, তাহাতে আমার কাজের শান্তি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

আমি ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মচর্য্যের প্রাচীন আদর্শে আমার ছাত্রদিগকে নির্জনে নিরুদ্বেগে পবিত্র নির্মলভাবে মানুষ করিয়া তুলিতে চাই। তাহাদিগকে সর্বপ্রকার বিলাতি বিলাস ও বিলাতের অন্ধমোহ হইতে দূরে রাখিয়া ভারতবর্ষের গ্লানিহীন পবিত্র দারিদ্র্যে দীক্ষিত করিতে চাই। তুমিও বাহিরে না হউক অন্তরে সেই দীক্ষা গ্রহণ করো। মনে দৃঢ়রূপে জানিবে যে, দারিদ্র্যে অপমান নাই, কৌপিনেও লজ্জা নাই, চৌকি টেবিল প্রভৃতি আসবাবের অভাবে লেশমাত্র অসভ্যতা নাই। যাহারা ধনসম্পদ, বাণিজ্য ব্যবসায়, আসবাব আয়োজনের প্রাচুর্য্যকে সভ্যতার লক্ষণ বলিয়া প্রচার করে তাহারা বর্বরতাকেই সভ্যতা বলিয়া স্পর্ধা করে। শান্তিতে, সন্তোষে, মঙ্গলে, ক্ষমায়, জ্ঞানে ধ্যানেই সভ্যতা; সহিষ্ণু হইয়া, সংযত হইয়া, পবিত্র হইয়া আপনার মধ্যে আপনি সমাহিত হইয়া, বাহিরের সমস্ত আকর্ষণ ও কলরবকে তুচ্ছ করিয়া দিয়া পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত একাগ্র সাধনার দ্বারা পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম দেশের সন্তান হইতে, প্রথমতম সভ্যতার অধিকারী হইতে, পরমতম বন্ধন মুক্তির আস্বাদন লাভ করিতে প্রস্তুত হও। তুমি মুখে কোনো বাদ প্রতিবাদ করিয়া অনর্থক সংঘর্ষে বল নষ্ট করিও না। স্তব্ধ মৌনভাবে অটল নিষ্ঠার সহিত ভারতবর্ষের নিকট একান্ত চিত্তে সর্ব্বোতভাবে আত্মসমর্পণ করো। তোমার বর্তমান শিক্ষা ও সঙ্গ এই ভাবের প্রতিকূল বলিয়াই এই বিরোধের সংঘাতে তোমার দৃঢ়তা আরও দ্বিগুণতর হইবে। এই বিরোধই তোমার শিক্ষার কারণ হইবে। আমি জানি তোমার অন্তরের মধ্যে ভারতবর্ষের সহজ মাহাত্ম্য আপনি বিরাজ করিতেছে—সে তোমাকে এতকাল অনেক বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছে—এখনো সে তোমাকে পরিত্যাগ করিবে না। ইংরাজ শিক্ষক তোমার এই স্বাভাবিক তেজকে ম্লান করিয়া নির্বাপিত করিবার অনেক চেষ্টা করিবে— সেই প্রতিকূল চেষ্টায় তোমার তেজ বর্ধিত হইয়া এই দুরূহ পরীক্ষা হইতে তোমাকে উত্তীর্ণ করুক, তোমার নিজের প্রতিভা তোমাকে রক্ষা করুক। বিদেশী ম্লেচ্ছতাকে বরণ করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয় ইহা হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিও। ''স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।'' মাঝে মাঝে পত্র লিখিয়া আমাকে সুখী করিবে। আগামী নববর্ষে তুমি নবতেজে নববলে ভারত সন্তান হইবার ব্রত গ্রহণ কর— সেই ব্রতকে প্রাণের চেয়ে বড় করিয়া মরণান্তকাল পালন করিও।

ইতি
আশীর্ব্বাদক
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৪ চৈত্র ১৩০৮

ভারতের পথে পথে

ঋষিকেশ



ভারতের আধ্যাত্মিক জায়গাগুলির মধ্যে অন্যতম হলো ঋষিকেশ। হিমালয়ের পাদদেশে উত্তরাখণ্ডে অবস্থিত এই ভূমিকে বিশ্বের যোগকেন্দ্র বলা হয়। হাজার হাজার বছর ধরে সাধু-সন্তরা এই স্থানে যোগসাধনায় ব্রতী রয়েছেন। অসংখ্য মঠ মন্দিরের সন্নিবেশে একটু শান্তি পেতে সারা পৃথিবী থেকে মানুষ সেখানে ছুটে আসে। বেগবতী গঙ্গা ও হিমালয়ের নির্মল বায়ু এই স্থানকে সর্বদা পবিত্র করে রেখেছে। এখানে সর্বদা বিরাজিত ভগবান শ্রীবিষ্ণু। পাহাড়ের নির্জন গুহায় ও নানা দুর্গম স্থানে দেখা মেলে তপস্যারত সাধু-সন্ন্যাসীদের।

এসো সংস্কৃত শিখি

গৃহে উপবিশ্য কিং করোতি ?

ঘরে বসে কী করছ?

ভবত: পরিচয: এব ন লব্ধ:।

তোমাকে চিনতেই পারিনি।

কিং ভো:, বহু কৃশ: জাত: ?

কী ব্যাপার, এত রোগা হয়ে গেছ?

অবশ্যং মম গৃহম্ আগন্তব্যম্।

অবশ্যই আমার বাড়িতে আসা চাই।

স: সর্বত্র দর্বীং চালয়তি।

সে সব ব্যাপারে নাক গলায়।

ভালো কথা

বর্ষার বিড়ম্বনা

কয়েকদিন আগে খুব বৃষ্টি হলো কলকাতায়। চারিদিকে জল আর জল। কোথাও হাঁটু জল কোথাও বা কোমর। গাড়ি চলাচল বন্ধ। যাদের খুব প্রয়োজন তারা জল পেরিয়েই যাতায়াত করছে। আমাদের বাড়ির রাস্তাতেও হাঁটুর উপর জল। এখানে সাধারণত বৃষ্টি থামার ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে জল নেমে যায়। কিন্তু এবার বিকেল হয়ে গেলেও জল নামল না। বাধ্য হয়ে প্যান্ট গুটিয়ে রাস্তায় নেমে পড়লাম। রাস্তায় একটি জায়গায় দেখলাম এক পথচারী ম্যানহোলের মুখে লাঠি নিয়ে কী যেন করছে। আমি চলে গেলাম। পরেরদিন খবরের কাগজে পড়লাম, প্লাস্টিক জমে ম্যানহোলের মুখ বন্ধ হওয়ায় শহরের জল নামছিল না। তখন আমার সেই পথচারীর কথা মনে পড়লো। তিনি লাঠি দিয়ে ম্যানহোলের মুখ পরিষ্কার করছিলেন।

তমাল কর্মকার, নবম শ্রেণী কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) শ ত র গ	(১) ল ড়ি ই গু শে
(২) ন দী দ ল	(২) রি গ্র গা স্থা ক

২৬ জুন সংখ্যার উত্তর

(১) দণ্ডকারণ্য (২) অণুবীক্ষণ	(১) টাটানগর (২) অজাতশত্রু

উত্তরদাতার নাম

(১) শঙ্খশুভ্র দাশ, সোনারপুর, দঃ ২৪ পরগনা। (২) শুভজিৎ পাল, বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা (৩) যাদব দাস, বরাবাজার, পুরুলিয়া। (৪) আলাপন দলুই, হলদিয়া পূর্ব মেদিনীপুর।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

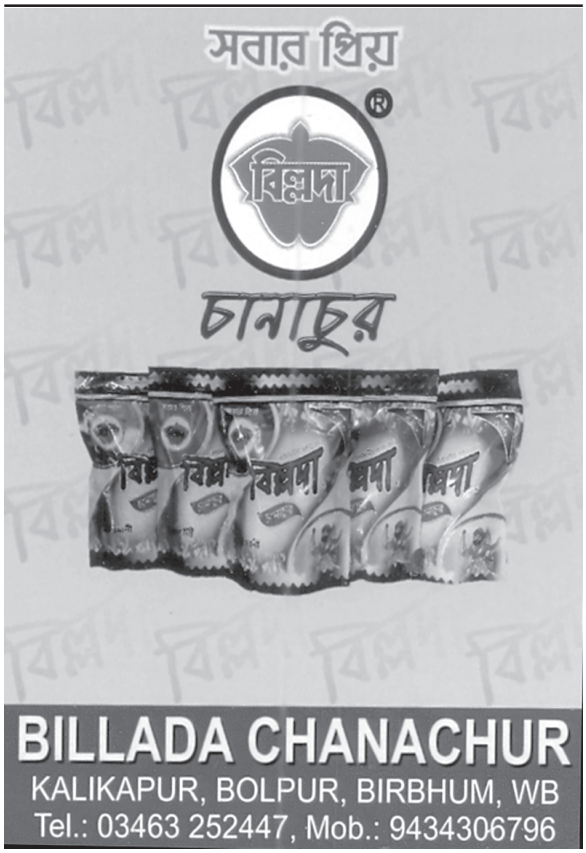

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধ তিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

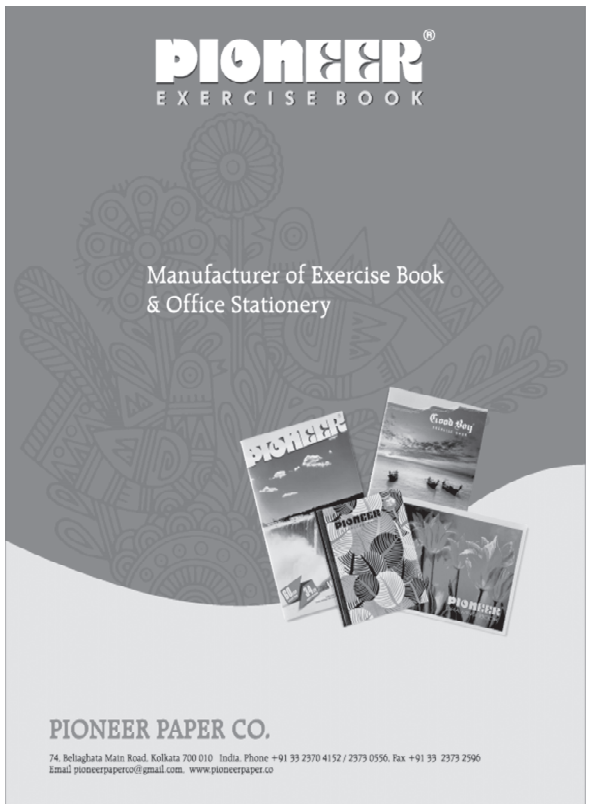

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. KOL RMS/048/2016-18
17 July - 2017 - Rs. 10.00,

SURYA

Energising Lifestyles

WHY SURYA LED ?

Wide beam angle for better light spread



The Next-Gen Surya LED lighting provides many advantages in terms of

- Eco Friendly
- Instant Lighting
- Low Maintenance
- High Energy Efficiency
- High Power Factor
- Lasts upto 25000 hrs
- Wide Operating Voltage Range*

WARRANTY 2 YEAR WARRANTY
ON ALL LED PRODUCTS

5W MRP ₹350/-

www.surya.co.in









*voltage range 100V - 300V

SURYA ROSHNI LIMITED

Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi - 110008 (INDIA) Tel : +91-11-47108000, 25810093-96,
Fax : +91-11-25789560 E-mail : consumercare@sroshni.com

Call Toll Free No. : 1800-102-5657 Join us on facebook at www.facebook.com/suryaroshni and share your thoughts!

Published and Printed by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6.
Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. ।। দাম ১০ টাকা ।।